এ যুদ্ধ আমাদের

শ্রীসুশীল কুমার বসু
প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান :
বসু ব্রাদার্স
৯।এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিনোদ রায়-কে

প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ

অর্পণ করিলাম

প্রস্তাবনা

যুদ্ধ সম্পর্কে একখানা ছোট বই লিখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতেই ছিল। কিন্তু, সময় ও উৎসাহের অভাবে এতদিন তাহা হইয়া উঠে নাই। এবারও যখন কাজে হাত দিই তখন শরীর ও মন বই লিখিবার উপযোগী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বইখানা লিখিও নাই। মুখে বলিয়া গিয়াছি এবং কন্যাস্থানীয়া রেণুকা দত্ত বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে বসিয়া তাহা লিখিয়াছেন। তাঁহার এই শ্রম স্বীকার ব্যতীত বইখানা এই সময় প্রকাশ করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। বইখানার ত্রুটি সংশোধন কার্য্যে বন্ধুদের আরও অনেকে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

কিন্তু, বই লিখিলেও তাহা প্রকাশ করা যে আজকাল কতটা দুঃসাধ্য তাহা বোধকরি সকলেই জানেন। আমার বিশেষ স্নেহভাজন সুলেখক জগদীশ বসুর সাহায্য এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বলিতে গেলে তাঁহারই উদ্যম ও চেষ্টায় মাত্র চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বইখানা ছাপা হইয়া বাজারে বাহির হইল। যুদ্ধের বাজারে এবং এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে বইখানাকে যতটা সম্ভব ত্রুটিহীন ও সুন্দর করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

আমার ভ্রাতা অজিত বসুও এইরূপ একখানা বই লিখিবার জন্য আমাকে অনেক দিন হইতেই বলিতেছিলেন। তাঁহার আগ্রহ ব্যতীত বইখানা লিখিতে হয়ত আমি উদ্যোগীই হইতাম না। আরও অনেক বন্ধু আমাকে নানাভাবে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের কাছেই আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ রহিল।

সর্ব্বোপরি বইখানাকে সুসম্পূর্ণ ও নিখুঁত করিবার জন্য যে যত্ন লওয়া উচিত ছিল তাহা লইতে পারি নাই, এজন্য পাঠকবর্গের নিকট হইতে মার্জ্জনা পাইব কি না জানি না। যুদ্ধের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বইখানা হইতে তাঁহারা যদি কিছু সাহায্য পান তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এই পুস্তকখানির শেষ কয়েকটি অধ্যায় সম্পর্কে আমার মৌলিকতার দাবী নাই। যুদ্ধের মৌলিক পরিবর্ত্তন কি ভাবে হইল—ভারতের স্বাধীনতার সহিত এ যুদ্ধের সম্পর্ক কোথায়, সেই কথাটাই লোকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে চাহিতেছে। তাই, সেই কথাটারই আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে করিয়াছি। আমাদের আশু কর্ত্তব্যের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছি।

পাঁজিয়া, যশোহর
৩রা জুলাই, ১৯৪২

সুশীল বসু

আমাদের কথা

আজ যে অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সমরাগ্নি বিশ্বপ্লাবন করিয়া সমগ্র জগতের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ধ্বংস করিতে চলিয়াছে, তাহার মধ্যে আত্মরক্ষা ও সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হইলে অচিরেই আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। দার্শনিক মনোবৃত্তি লইয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া অলসভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দর্শনের ন্যায় বর্ত্তমান সমরাগ্নিকে সকৌতুকে উপভোগ করাও মারাত্মক।

কিন্তু কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে যুদ্ধমান পক্ষগুলি কোন্ ঐতিহাসিক ও সামাজিক শক্তির প্রতিভূ হইয়া লড়িতেছেন তাহার বিচার আবশ্যক। যে পক্ষ জনগণের প্রতিভূস্বরূপ ফ্যাশিস্তদের কবল হইতে বিশ্বজনমুক্তির চেষ্টা করিতেছেন, আমাদের বাঁচিবার চেষ্টা ও মুক্তির প্রয়াস, তাঁহাদের সহিত জড়িত। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেরই সহানুভূতি ফ্যাশিস্ততন্ত্রের দিকে। হাটে, মাঠে, ট্রামে, বাসে যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা হইতেই ইহা প্রতীয়মান হয়। এরূপ মনোভাব আমাদের চিন্তার অভাব ও স্বার্থবিষয়ক অজ্ঞতাই প্রকট করে। লেখক এই রচনার ভিতর দিয়া বিচার, আলোচনা ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা এই অজ্ঞতা ও তৎপ্রসূত ফ্যাশিষ্টপন্থী মনোভাব দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রকাশক

লেখক-পরিচয়

বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীসুশীলকুমার বসু যশোহর জেলার পাঁজিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে ইনি নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। ঐ সময় হইতে নানা প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে তিনি নানা বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে ইনি বহু বর্ষ ধরিয়া অধুনা লুপ্ত 'বিচিত্রা'য় 'দেশের কথা' শীর্ষক সন্দর্ভ সমূহে দেশীয় বিবিধ সমস্যার আলোচনা লিখিয়াছিলেন। বলিতে গেলে বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম রাজনীতিক পত্রিকা 'প্রগতি' ইঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

বর্ত্তমানে ইনিই সর্ব্বপ্রথম দেশীয় বৃহৎ সমস্যাসমূহ মার্ক্সীয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহার অধুনা প্রকাশিত 'কৃষক আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত' ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল সুধী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিন্দু না মুসলিম' প্রকাশিত হইতেছে; এই গ্রন্থে আমাদের দেশের রাজনীতির অগ্রগতির পথরোধক সাম্প্রদায়িক সমস্যাসম্বন্ধে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া মৌলিক আলোচনা করা হইয়াছে।

লেখক, বাংলার রাজনীতিক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা। ইহার লেখাগুলি বহুস্থানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্দীপ্ত।

এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধ শেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
ব'লে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারেনা কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

—রবীন্দ্রনাথ।

This war is Breaking the Social ice Everywhere. War releases dynamic forces. If Properly Directed they could win the war and the peace.

এ যুদ্ধ আমাদের

আমাদের সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন

তিনটি মহাদেশের জল স্থল অন্তরীক্ষে শক্তির যে বিপুল সংঘর্ষ চলিতেছে তাহার ঘুর্ণীপাকের মধ্যে আজ ভারতবর্ষ জড়াইয়া পড়িয়াছে। শত্রু আজ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পা বাড়াইয়াছে, তাহার সুবিস্তৃত উপকূল ভাগ শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাহার বড় বড় সহর ও বন্দরগুলি শত্রুর বোমারু বিমানের পাল্লার মধ্যে রহিয়াছে, কাজেই এই মুহূর্ত্তেই আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে হইবে। বিন্দুমাত্র সময়ের অপচয় ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে।

যুদ্ধ যদি ভারতবর্ষের দ্বারদেশে নাও আসিত তাহা হইলেও নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা অবশ্য আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইত না। কেন না, পৃথিবীর কোন দেশের রাজনীতিক ভাগ্য তাহার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নাই। বিশ্বঘটনাবলীর চাপে প্রতি দেশেরই ভাগ্য গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তবুও যুদ্ধ যতদিন দূরে ছিল ততদিন যুদ্ধের সংবাদের উত্তেজনায় নিরাপদে মগ্ন থাকিয়া দিন কাটিয়া যাইত। অন্তত আপাততঃ গায়ে আঁচড় লাগিবার ভয় ছিল না।

কিন্তু, বর্ত্তমানে আর সে অবস্থা নাই। সমস্ত লোকের ধন, প্রাণ, সম্ভ্রম ও জীবনযাত্রা আজ আসন্ন বিপদের সম্মুখে, তাই যুদ্ধের জন্য চিন্তা ও ঔৎসুক্য আজ আর মাত্র রাজনীতিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। দেশের জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ত্রাস ও আতঙ্ক জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও দিশাহারা করিয়া ফেলিয়াছে। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে আজ আর বিলম্ব করিবার অবসর নাই।

কিন্তু, অবস্থা যেমন ভয়াবহ সমস্যাও তেমনই জটিল। সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তি সংগ্রামের মধ্যেই জাতীয়তার উদ্ভব, মুক্তি প্রচেষ্টার মধ্যেই তাহার পুষ্টি। ব্রিটীশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষোভ বহুদিন হইতেই সঞ্চিত। তাই এই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কটে আমাদের মন স্বভাবতই খুসী হইয়া ওঠে। সেই সঙ্কটের সুযোগে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে ছিনাইয়া লওয়া উচিত এই চিন্তাই আমাদের মনে উদিত হয়। এই পথ ছাড়িয়া যাইতে আমাদের মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। যুদ্ধ যতদিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছিল ততদিন যুদ্ধের সহযোগিতা না করাই ছিল সর্ব্বস্বীকৃত নীতি। ততদিন যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রশ্ন আমাদের কাছে জটিল হইয়া ওঠে নাই।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্ম্মানী কর্ত্তৃক সোভিয়েট রুশিয়ার উপর আক্রমণে যুদ্ধের যখন ধর্ম্মান্তর হইল তখন ভারতবর্ষের ন্যায় ঔপনিবেশিক দেশের পক্ষে সমস্যা বিশেষ

দুরূহ হইয়া উঠিল। ইতিহাসের গতিপথে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বৃটেন পৃথিবীর একমাত্র সাম্যবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েট রুশিয়াকে যুদ্ধের সহযোগী এবং শীঘ্রই নেতা হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বের গণমুক্তির সংগ্রামে পরিণত হইল। জাপান অতি শীঘ্র ভারতবর্ষের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করিয়া তোলায়, সমস্যা আমাদের পক্ষে বিশেষ ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের মুষ্টি বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতিগতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, অথচ জাপানীদের বাধা দিতে গেলে ইংরেজেরই সহযোগিতার নামান্তর হইবে মাত্র। আবার যদি জাপানীকে বাধা দেওয়া না যায় তাহা হইলে আমাদের নিজেদের বাড়ী ঘর, ধন সম্পত্তি ও জীবন বিপন্ন ও পর্য্যুদস্ত হইবে। এতদিনের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। বহু নির্য্যাতন ও দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়া যে জাতীয় চেতনা ও শক্তি লাভ হইয়াছে ফ্যাশিষ্ট কবলে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইবে। কিন্তু, ভারতবর্ষে একথা সাহস করিয়া কে বলিতে পারে যে, আজ দ্বিধাহীন চিত্তে দৃঢ় সঙ্কল্প ও সমস্ত শক্তি লইয়া ফ্যাশিষ্টদের আঘাত করিতে হইবে—তাহাতেই জাতীয় মুক্তির সন্ধান মিলিবে—জাতীয়-মুক্তি ও বিশ্ব-মুক্তির মধ্যে বিরোধ নাই। ব্রিটীশ বিরোধ পুষ্ট তীক্ষ্ণ জাতীয়তা বোধের যে প্রবল প্রতি-ক্রিয়া সারা ভারতবর্ষে দেখা দিবে কে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে।

এতদিনের জাতীয়তার আদর্শে অভ্যস্ত আমাদেরই মন কি দ্বিধাহীন ভাবে এই কথায় সায় দিতে পারে ?

এইভাবে যখন সংশয় ও সন্দেহে সমগ্র দেশ সমাচ্ছন্ন, তখন কম্যুনিষ্টরাই প্রথম ফ্যাশিবিরোধী নীতির সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিলেন। দেশের রাজনীতিক মহলে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। লোকের মুখে মুখে প্রশ্ন শেষ পর্য্যন্ত কি ইংরেজের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে দেশের ছোট বড় অন্যান্য রাজনীতিক দলগুলি কোন না কোন আকারে এই ফ্যাশিবিরোধী নীতিই গ্রহণ করিয়াছে। যদিও একমাত্র কম্যুনিষ্টরাই নিরলসভাবে দেশময় জাপ-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। ছাত্র ফেডারেশন, কৃষক-সভা ও সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত এই নূতন ভাবধারা ছড়াইতেছেন।

তবুও লোকের প্রশ্নের অবসান হয় নাই। জাপানের বিরুদ্ধতা করিলে কি ইংরেজের সহযোগিতা করা হইবে না ? আমরা সহযোগিতা করিতে চাহিতেছি, কিন্তু অন্য পক্ষ হইতে কি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত হইয়াছে ? এই যুদ্ধে যদি মিত্রপক্ষের জয় হয় তাহা হইলে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ কি করিয়া লুপ্ত হইবে ? যুদ্ধান্তে ব্রিটেন কি ভারতকে স্বাধীনতা দিবে ? সোভিয়েট রুশিয়া কি ভারতের পক্ষে কথা বলিবে ? এই প্রকারের আরও অনেক প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলি সব সময় প্রাসঙ্গিক ও সংলগ্ন না হইলেও ইহার মধ্যে একটা উদ্বেগ ফুটিয়া

উঠিতেছে। সে উদ্বেগ হইতেছে, এই যুদ্ধ ভারতের পক্ষেও মুক্তি-যুদ্ধ হইবে কি না। আমাদের সকল প্রশ্ন যে মুক্তি প্রশ্নের মাপ-কাঠিতে মাপিয়াই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে। ফ্যাশিবিরোধী বিশ্ব সংগ্রামের সহিত ভারতের মুক্তি সংগ্রাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত বলিয়াই এই সংগ্রামকে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই সম্বন্ধকে আবরণ মুক্ত করিতে হইলে যুদ্ধের মূল চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করিতে হইবে, সমাজের যে গতিশীল শক্তি ইহাকে সম্ভাবিত করিতেছে তাহার সন্ধান নিতে হইবে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কারণ

আমরা ভুল করিয়া মনে করিয়া থাকি, জাতিতে জাতিতে হিংসা দ্বেষ অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের যুদ্ধ স্পৃহার ফলে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা অথবা অন্য কোন আকস্মিক কারণ যুদ্ধের জন্য দায়ী নহে। যুদ্ধের কারণ গভীরতর, ইহা সমাজের মূলদেশে নিহিত। আমরা সর্ব্বত্রই শুনি, এযুদ্ধ কাঁচা মালের জন্য যুদ্ধ, বাজার পাইবার যুদ্ধ, এবং পুঁজি খাটাইবার জায়গা দখলের জন্য যুদ্ধ। কথাটার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

কারখানা-শিল্প প্রবর্ত্তনের আগে কৃষিপ্রধান সমাজে কুটির শিল্পের প্রচলন ছিল। কারখানা শিল্পের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন সুরু হইল। পূর্ব্বে বহু লোকে বহু সময় ধরিয়া যে পণ্য উৎপাদন করিত কারখানায় অনেক অল্প লোকে অনেক অল্প সময়ে তাহা উৎপাদন করিতে থাকিল। পূর্ব্বে উৎপাদনকারীরা উৎপন্ন জিনিষের মালিক হইত, বর্ত্তমানে কারখানার মালিকই মাত্র সেই সব জিনিষের একক মালিক হইলেন। এবং পূর্ব্বে যতলোক এই উৎপাদনে ব্যাপৃত ছিল, তাহার সামান্য সংখ্যক মাত্র শ্রমিক হিসাবে কারখানায় কাজ পাইল, আর অবশিষ্টেরা বেকার হইয়া পড়িল। ইহার ফল হইল, পূর্ব্বে যে-সম্পদ সমাজের মধ্যে বন্টিত হইত, তাহা এক স্থানে সঞ্চিত হইতে লাগিল

এবং দেশের মধ্যে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার আবির্ভাব ঘটিল।

কারখানার মালিকেরা ইহাতে এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। পূর্ব্বে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি দেশের মধ্যে বণ্টিত হইবার যে উপায় ছিল তাহা বন্দ হইয়া গেল। দেশের লোক দরিদ্র ও বেকার, জিনিষ কিনিবে কে? কাজেই কারখানার মালিকদের সামনে দুটি সমস্যা দেখা দিল। তাহাদের জিনিষ বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজার চাই। না হইলে উৎপন্ন মাল পড়িয়া থাকে। আবার দেশের সাধারণ লোকের বেকার সমস্যা ঘুচানো চাই। নহিলে দেশে দারিদ্র্যে এবং অনাহারে তাহারা বিপ্লব ঘটায়। তাহার পরে দেশের লোককে যদি কাজ দিতে হয় তাহা হইলে আরও কারখানা স্থাপন করা দরকার। তাহার জন্য আরও বিস্তৃত বাজার চাই। আরও বেশী কারখানা স্থাপনের তাগিদ অবশ্য আসিয়াছে বেশী মুনাফার লোভ হইতে। কাজেই যে কোন রকমে বিস্তৃত বাজার চাই।

এই বিরাট উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখিবার জন্য আবার কাঁচা মাল চাই। কোন এক দেশের মধ্যে এত কাঁচা মাল পাওয়া কষ্টকর। তদুপরি শ্রমশিল্পের প্রসার এবং কৃষির সঙ্কোচন বা বিলোপের সঙ্গে কাঁচা মাল অপ্রাপ্য হইয়া ওঠে। এই কাঁচা মাল যোগাইবার দেশও হাতে থাকা চাই।

এখন এই বাজার ও কাঁচা মাল যোগাইবার দেশটা কি? যে সকল দেশে কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে সকল দেশে অন্য দেশের পণ্য আনিয়া বিক্রয় করা যায় না। এজন্য এমন দেশ চাই যেখানে কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কুটির শিল্পই যাহার প্রধান অবলম্বন। এখান হইতেই আবার কাঁচা মাল পাওয়া যায়।

কিন্তু, বাজার ও কাঁচা মালের দেশের প্রয়োজন বোঝা গেলেও ইহার জন্য সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজন কি? কোন পশ্চাদ্বর্ত্তী কুটির শিল্পের দেশের রাষ্ট্রক্ষমতাকে যদি অধিকার করা না যায়, তাহা হইলে সেখানেও কালক্রমে ধনিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ও কারখানা শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই ভাবে একদিন বাজার হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। আবার অন্যান্য শিল্প প্রধান দেশও এই সকল বাজারে, এবং কাঁচা মালের ক্রয়ে প্রতিযোগিতা করিবে, স্থানীয় কুটির শিল্পের প্রতিযোগিতাকেও ধ্বংস করা চাই। এই সকল প্রয়োজনে বাজার ও কাঁচা মালের দেশকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের অধীনে রাখা—সব শিল্প প্রধান দেশের ধনিক শ্রেণীর লক্ষ্য। এই ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজন হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী দেশগুলি এইভাবে কোন না কোন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শোষণের ক্ষেত্র হইয়া আছে।

কিন্তু পৃথিবীতে শোষণের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ।

ধনিক রাষ্ট্রগুলির প্রয়োজন অফুরন্ত। ফলে, সাম্রাজ্যের বিস্তার অর্থাৎ পৃথিবীর শোষণ ক্ষেত্রের অধিকার লইয়া ধনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আত্মকলহ অপরিহার্য্য। ইহার উপর বিভিন্ন উপনিবেশ গুলিতে কিছু কিছু কারখানা শিল্প প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাড়িয়া উঠিতেছে এবং সঞ্চিত বিপুল পুঁজি খাটাইবার জায়গা ধনিক রাষ্ট্রগুলির নিজ নিজ দেশে নাই। এই জন্য বাজার পাইবার প্রতিযোগিতার সহিত আবার পুঁজি, লগ্নী করিবার ক্ষেত্র লইয়াও বিরোধ দেখা দিয়াছে। যাহার হাতে বিস্তৃত শোষণ ক্ষেত্র থাকিবে সেই ধনিক গোষ্ঠি বাঁচিয়া যাইবে, অন্যদের বাঁচিবার পথ নাই। এই ভাবে পৃথিবীর ধনিকতন্ত্রকে আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। ইহাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, বিভিন্ন দেশের ধনিক-শ্রেণীর মধ্যে যে পারস্পারিক প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহা ব্যতীত আর এক দিক হইতেও আর একটি বিপদের সহিত তাহাদিগকে সব সময় লড়িতে হয়। কারখানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। দুঃখ বঞ্চনা, কর্ম্মের অনিশ্চয়তা ও কর্ম্মহীনতা ইহাদের নিত্য সঙ্গী। কোন দেশের ধনিকশ্রেণী যেমন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশ-গুলিকে শোষণ করে, তেমনি নিজ দেশের শ্রমিকদেরও সমান ভাবে শোষণ করে। আবার যখন সাম্রাজ্যের অধিকার লইয়া বিভিন্ন ধনিকরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া ওঠে তখন

প্রত্যেক ধনিক রাষ্ট্রই নিজ নিজ দেশের শ্রমিকদের বলি দিয়া এই যুদ্ধ চালায়। কিন্তু, দুঃখ ও বঞ্চনার আঘাত পৃথিবীর সব দেশের শ্রমিকদের সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া শ্রমিকদের বিপ্লব বহ্নি আজ ধূমায়িত। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যেমন অপরিহার্য্য তেমনি নবজাগ্রত শ্রমিক শক্তির সহিত ধনিকতন্ত্রের শক্তি পরীক্ষাও অপরিহার্য্য।

ধনিক-তন্ত্রের সম্মুখে নূতন বিপদ

গত মহাযুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা হইতেছে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এতদিন ধনিকতন্ত্রের আধিপত্য চলিতেছিল। এইবার তাহার এক ষষ্ঠাংশে নূতন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি পত্তন হইল। ধনিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ইহা বিশেষ বিপদ ও শঙ্কার কারণ হইয়া থাকিল। কারণ প্রত্যেক ধনিক রাষ্ট্রে বর্দ্ধমান শ্রমিক চেতনা ও ঐক্যের কথা যাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাই ধনিক রাষ্ট্র-গুলির পক্ষে সবচেয়ে বড় সমস্যার বিষয়। শ্রমিকদের বর্দ্ধমান চেতনা ও ঐক্যের প্রতীক ও আদর্শ স্বরূপ থাকিয়া সোভিয়েট রুশিয়া প্রতি দেশেরই জনগণের মুক্তি আন্দোলনে শক্তি ও প্রেরণা যোগাইতে লাগিল। যে-বিপদ প্রতিদিনই হাতের বাহিরে যাইতেছিল তাহা স্থায়ী ও শক্তিশালী আশ্রয় পাইয়া গেল। তাই সোভিয়েট রুশিয়া পৃথিবীর ধনিক রাষ্ট্রগুলির সাধারণ শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। সকলেই সোভিয়েট রুশিয়াকে প্রধান শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। জগৎ দ্বিধা বিভক্ত হইল। একদিকে সাম্রাজ্য শক্তিপুষ্ট পৃথিবীর ধনিকমণ্ডলী আর একদিকে সোভিয়েটের নেতৃত্বে পৃথিবীর নিঃস্ব জনমণ্ডলী। যতই দিন যাইতে লাগিল এই বিভাগ ততই পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

ধনিক রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েটকে একঘরে করিলেন। তাঁহাদের বিরাট শক্তিশালী প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়া সোভিয়েট ধীরে ধীরে জগতের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর উপর দৃঢ়তর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলি মন্দারপর মন্দার আক্রমণে বিব্রত হইতে লাগিল। সর্ব্বদেশে বেকার সমস্যা ও শ্রমিক অসন্তোষ উৎকট সমস্যার আকারে আবির্ভূত হইয়া আর্থিক অবস্থাকে ওলট পালট করিয়া দিবার উপক্রম করিল। আর সোভিয়েট রুশিয়া এই সময়ে কৃষিপ্রধান পশ্চাদ্বর্ত্তী দেশ হইতে শিল্প প্রধান উন্নত দেশে পরিণত হইল। বেকার সমস্যা সেখানে তিরোহিত হইল। বাজার মন্দার সমস্যা উঠিল না, একদিনে পদদলিত ও নিঃস্ব শ্রমিকেরা ক্ষমতা, স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা প্রভৃতি মানুষের সর্ব্ববিধ কাম্য বস্তুর অধিকারী হইল। দুনিয়ার শ্রমিক ও নিঃস্ব জনসাধারণের সম্মুখে নূতন আশার জগৎ খুলিয়া গেল। শ্রমিক বিপ্লবের আশঙ্কাই ধনিক রাষ্ট্রগুলির বৃহত্তম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল এবং সোভিয়েট রুশিয়াকে চূর্ণ করিয়া বিপদের মূল উৎপাটন করাই ইহাদের সকলের প্রধান লক্ষ্য হইল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রাজনীতি সোভিয়েটের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সঙ্কট ঘনীভূত

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের অবসানের পর জার্ম্মানীকে সর্ব্বপ্রকারে পঙ্গু করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু, এই ব্যবস্থার মধ্যে ইতিহাসের গতিশীলতা থামিয়া থাকিল না। জার্ম্মানী আবার রাষ্ট্র হিসাবে মাথা তুলিতে লাগিল। ইওরোপের আধিপত্যের প্রশ্ন লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যে নির্ব্বাক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল জার্ম্মান ধনিকতন্ত্রকে তাহাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ দিল। জার্ম্মানীর ঘাড়ে বিপুল ক্ষতি-পূরণের বোঝা চাপান হইয়াছিল সেই ক্ষতি পূরণের টাকা দিয়াই আবার আমেরিকার ঋণ শোধ হইবে।

কিন্তু, জার্ম্মানী ঋণ শোধ করিবে কি করিয়া—তাহার উৎ-পাদন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইলে যে আর্থিক সম্বলের প্রয়োজন জার্ম্মানীর তাহা নাই। ব্যবস্থা হইল জার্ম্মানী আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ পাইবে এবং সেই টাকার সাহায্যে আর্থিক কাঠামোকে গড়িয়া তুলিয়া ক্ষতি পূরণের টাকা শোধ করিবে। জার্ম্মানীর শ্রমশিল্প আমেরিকার মূলধনে আবার গড়িয়া উঠিল। জার্ম্মানী ইংরেজ এবং ফরাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে ব্রিটীশ সহায়তায় অস্ত্র-সজ্জার অধিকারও ক্রমে ছিনাইয়া লইতে লাগিল। এই ভাবে জার্ম্মানীর শক্তি ও প্রতিষ্ঠা আবার ফিরিয়া আসিল।

জার্ম্মানীকে এইভাবে বাড়িতে দিবার আরও শক্তিশালী কারণ ছিল। সোভিয়েট রুশিয়ার শক্তি ও প্রভাব ধনিক রাষ্ট্রগুলিকে ক্রমেই অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত করিতেছিল। কাজেই উৎসাহ দিয়া প্রতি-বিপ্লবের শক্তিকে তাঁহারা পুষ্ট করিয়া তুলিতেছিলেন। জার্ম্মান ধনিকতন্ত্র বুঝিয়াছিল যে, যুদ্ধ ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই। অস্ত্রসজ্জাকেই তাহারা লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিল।

জার্ম্মানীর হাতে সাম্রাজ্য ছিল না। কাজেই প্রতিযোগিতায় জার্ম্মান ধনিকতন্ত্রের টিকিয়া থাকা দায় হইল। মুনাফা কম হইলে শ্রমিকদের আরও কম বেতন দিয়া তাহা পোষাইয়া লইতে হয়। আবার কল-কারখানার পর্য্যাপ্ত প্রসার অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলে শ্রমিকদের মধ্যে বেকার সমস্যা ব্যাপক হইয়া ওঠে। এই অবস্থায় বিপন্ন জার্ম্মান ধনিকতন্ত্রের কঠোর হস্তে শ্রমিক দমন নীতি গ্রহণ করা ব্যতীত বিপ্লবকে ঠেকাইয়া রাখিবার আর কোন উপায় থাকিল না। তাহার জন্য ধনিক-শ্রেণীর অব্যাহত কর্ত্তৃত্ব ও সামরিক শক্তির প্রয়োজন। এই অবস্থার মধ্যে ফ্যাশিবাদের উদ্ভব হইল।

ফ্যাশিজম একদিকে যেমন আসন্ন পতন হইতে ধনিকতন্ত্রকে সাময়িক ভাবে বাঁচাইল, তেমনি তাহাকে ভবিষ্যতে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে অস্ত্রসজ্জা করিতে লাগিল।

অস্ত্রসজ্জা যেমন তাহার ভবিষ্যতের প্রয়োজন বর্ত্তমানেও ইহা তাহার সমস্যার ভার কিছু পরিমাণে লাঘব করিল।

কারণ যুদ্ধ করিয়া বাজার দখলের জন্য সাম্রাজ্য বিস্তার ব্যতীত জার্ম্মান ধনিকতন্ত্রের ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করিবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। তাহাকে হয় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া বিপ্লবের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, না হয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কাজেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া জার্ম্মান ধনিকতন্ত্র বাঁচিয়া থাকিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

এই অস্ত্রসজ্জার আয়োজন তাহার আপাত সমস্যাকে লঘু করিয়া দিল। কারণ, অস্ত্র প্রস্তুতের জন্য অনেক লোককে কাজ দেওয়া গেল। সৈন্য বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুলোক নিযুক্ত হইল। এইভাবে সমর-প্রস্তুতি জার্ম্মানীকে কিছুকালের জন্য শ্রমিক ও বেকার সমস্যার হাত হইতে মুক্তি দিল। কিন্তু, এইভাবে সমস্যাকে বেশী দিন ঠেকাইয়া রাখা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধেই তাহার সমাধানের সন্ধান করিতে হইবে। এজন্য বিভিন্ন দেশের অস্ত্রের কারখানার সহিতও তাহার অস্ত্র-সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল।

প্রশ্ন হইবে ব্রিটীশ, ফরাসী এবং আমেরিকা এই সময়ে কি চোখ বুজিয়া ছিল? জার্ম্মানী প্রস্তুত হইবার আগে তাহারা জার্ম্মানীকে চূর্ণ করিয়া দিতে পারিত। এই সময়ে ইহাদের অবস্থা ও মনোভাবটাও আলোচনার যোগ্য। বৃটেন ছিল পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধিকারী, ফরাসী

ছিল দ্বিতীয় স্থানীয়। আমেরিকাকে অদৃশ্য সাম্রাজ্যের অধিকারী বলা হইত। ইহার সুদূর প্রসার ছিল সারা পৃথিবীব্যাপী। জার্ম্মান ধনিকতন্ত্রের সম্মুখে যে সমস্যা ছিল ইহাদের সমস্যা ছিল অনেকটা তাহার বিপরীত। অর্থাৎ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য হাতে থাকায় বাজারের অভাবটা ইহাদের ততটা তীব্র ছিল না। বাজার অর্থাৎ সাম্রাজ্য যাহাতে হাতছাড়া হইয়া না যায় তাহাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য ও কাম্য। গত মহাযুদ্ধে পৃথিবীর বণ্টন যেভাবে হইয়াছিল, যাহাতে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাই ছিল ইহাদের রাজনীতির মূল ভিত্তি। জার্ম্মান ধনিকতন্ত্রের বাঁচিবার উপায় ছিল পৃথিবীর পুনর্বণ্টনে, ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন ধনিকতন্ত্রের পৃথিবীর পূর্ব্ব বিভাগ ও পূর্ব্ব বাটোয়ারা বজায় রাখায়।

সাম্রাজ্যের উপর জার্ম্মান ধনিক গোষ্ঠির যেমন লোলুপ দৃষ্টি ছিল সাম্রাজ্যের অধিকারীদেরও তেমনি সাম্রাজ্য রক্ষার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু, তাহারা সাম্রাজ্য হারাইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক হইতে করিতেছিল বলিয়া জার্ম্মানীর শক্তি বৃদ্ধি অপেক্ষা সেই দিকেই তাহাদের নজর ছিল বেশী। এক দিকে তাহাদের নিজ নিজ দেশে শ্রমিক আন্দোলন যেমন সাম্রাজ্যবাদকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছিল তেমনি বিভিন্ন উপনিবেশে জাতির জাগরণের ও মুক্তি প্রচেষ্টার প্রবল আঘাত, দিনের পর দিন সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি দুর্ব্বল করিয়া দিতেছিল। আবার বিশ্বের গণমুক্তির এই যে

অন্তঃপ্রবাহ তাহার সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার ঘনিষ্ঠ আদর্শগত সংযোগ ছিল। পৃথিবীর শোষিত জনগণ সোভিয়েটকেই তাহাদের মুক্তির প্রতীক এবং মুক্তি যুদ্ধের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

সাম্রাজ্যভোগীরা তাই সোভিয়েট রুশিয়াকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহাদের অধীনস্থ উপনিবেশগুলির মুক্তি প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার কাজেই তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন এবং ফ্যাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লাগাইয়া তাহার ধ্বংস সাধনের আশা পোষণ করিয়াছেন। ফ্যাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সহিত শক্তি পরীক্ষায় যে তাঁহাদের নিজেদের অবতীর্ণ হইতে হইবে, সে কথা তাঁহারা মনে করেন নাই। এজন্য তাঁহাদের যুদ্ধের আয়োজনও তদনুরূপ হয় নাই। তাঁহাদের যুদ্ধের আয়োজন ও লক্ষ্যই ছিল উপনিবেশগুলিকে আয়ত্তে রাখা।

জার্ম্মান ধনিক গোষ্ঠিও ইহাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিল। জার্ম্মানীর বিপন্ন ধনিকতন্ত্রকে বিপ্লবের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য অবশ্য তীব্র সোভিয়েট বিরোধী নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যভোগী রাষ্ট্রগুলির সোভিয়েট বিরোধী মনোভাবের অন্তরালে ফ্যাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া লইল। ইহাদের সোভিয়েট-বিরোধী চীৎকারে সাম্রাজ্যভোগীরা একথা ভুলিয়াই

গেলেন যে এই অস্ত্র একদিন তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে।

জার্ম্মাণী তাহার ভবিষ্যৎ অভিযানে সহযোগীরূপে জাপান ও ইটালীকে পাইল। গত যুদ্ধের পরের বাটোয়ারায় ইটালী খুসী হয় নাই। তাহারও স্থানের প্রয়োজন ছিল, এবং এই প্রয়োজন জাপানেরও ছিল। এখানকার বর্দ্ধমান ধনতন্ত্রের সম্মুখে একই সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুদ্ধ জাপানীরাই প্রথমে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া আরম্ভ করিল। তাহার অনুসরণ করিল ইটালী। সাম্রাজ্য-ভোগীরা তখনও ইহাদের চটাইতে চাহিলেন না। তখনও তাঁহাদের আশা ছিল, ইউরোপ ও এশিয়ায় প্রতিবিপ্লবকে পুষ্ট করিয়া সোভিয়েটকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিতে ও তাহার শ্বাসরোধের কার্য্যে এই শক্তিকে নিয়োজিত করিতে তাঁহারা সমর্থ হইবেন।

কিন্তু, ব্যাপার ঘোরাল হইয়া উঠিল যখন জার্ম্মানী খাস ইওরোপে হাত বাড়াইল। ফ্যাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করিয়া জার্ম্মানী জানিত যে, তাহাদের পক্ষ বিস্তারের দুইটি জায়গা আছে। এক সোভিয়েট রুশিয়া আর ব্রিটীশ এবং ফরাসীর উপনিবেশ সমূহ। হিটলারের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সহিত একযোগে রুশিয়াকে আক্রমণ করা হয়ত সুবিধাই হইত, যদি সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক শক্তি এত বেশী না হইত। হিটলার সোভিয়েটের সামরিক শক্তির বিষয় অবগত

ছিলেন। তিনি নিজের দুর্ব্বলতার কথাও জানিতেন। সমস্ত ইওরোপ তখন তাঁহার করতলগত হয় নাই অথচ সোভিয়েটের সহিত যুদ্ধের নেতৃত্ব তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইত। যুদ্ধে কোন রকমে জয় হইলেও ধ্বংস হইত জার্ম্মানী, আর লুণ্ঠনের ভাগ লইত অন্যেরা।

কাজেই, হিটলার প্রথমে ইওরোপের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি অধিকার করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধির কাজে মন দিলেন, আর ব্রিটীশ ও ফরাসী শাসকেরা পশ্চাতে থাকিয়া সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তাহাকে যুদ্ধে লাগাইবার আশায় তোয়াজ করিতে লাগিলেন। ইহার পরিণতি হইল ম্যুনিকে, সোভিয়েট বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের চেষ্টা হইতে লাগিল।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আরম্ভ

১৯৩৯ সালের ২১শে আগষ্ট বিশ্বের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি এতদিন যে অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছিল এইদিন সহসা তাহার মোড় ঘুরিয়া গেল। ষ্ট্যালিনের দক্ষ কূট নীতি জয়ী হইল। সোভিয়েটকে সম্মিলিতভাবে বেষ্টন করিবার নীতি জার্ম্মানী ও সোভিয়েটের মধ্যে অনাক্রমণ-চুক্তিতে ব্যর্থ হইয়া গেল। এই অনাক্রমণ-চুক্তির কথা যখন প্রকাশ পাইল ব্রিটীশ এবং ফরাসী শাসক গোষ্ঠি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন তাঁহাদের এতদিনের আশা নির্ম্মূল হইল। এখন জার্ম্মানীর ধাক্কা তাহাদিগকে সামলাইতে হইবে। জার্ম্মানী পৃথিবীর পূর্ণবণ্টন চাহিবে এবং ব্রিটীশ ও ফরাসী উপনিবেশই তাহাদের লক্ষ্য হইবে। জার্ম্মানী যখন সোভিয়েটের দিকে অগ্রসর হইল না, তখন পৃথিবীর বাজারের ভাগ লইয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আত্মকলহ অপরিহার্য্য। ১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করিল। ৩রা সেপ্টেম্বর ইংরেজ ও ফরাসী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইংরেজ ও ফরাসী শাসকেরা জানিতেন যে তাঁহারা আক্রমণের লক্ষ্য হইবেন, সেটা মাত্র সময়ের প্রশ্ন। এই জন্যই এই যুদ্ধকে তাঁহারা নিজেদের যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই যুদ্ধে অপর কাহারও লাভ ছিল না।

যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলির শ্রমিকদের ও সাধারণ লোকের বিন্দুমাত্র স্বার্থ ছিল না।

এতদিন ধরিয়া পৃথিবীর দুইদিকে দুইটি দল ছিল। এক দিকে ছিল বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ—পৃথিবীর ধনিক রাষ্ট্রগুলির শোষণ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সম্মিলিত প্রয়াস। প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিষ্ট এবং ফ্যাশিষ্টপন্থীরা ছিলেন ইহার নেতা। ইহারা পৃথিবীকে যুদ্ধ ও উপনিবেশিক দাসত্বের দিকে লইয়া যাইতেছিলেন। অপর দিকে ছিল সোভিয়েট নেতৃত্বে বিশ্বের জনগণ। ইহাদের লক্ষ্য ছিল প্রগতি—অগ্রগমন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পৃথিবীর অগ্রবর্ত্তী জনগণ ছিলেন ইহার নেতা। ফ্যাশিবিরোধী বিশ্বের সম্মিলিত শান্তি ফ্রণ্ট এইভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল। ফ্যাশিষ্ট আক্রমণকে বাধা দেওয়াই ছিল ইহার লক্ষ্য। প্রত্যেক দেশের জন্য (উপনিবেশ গুলি যাহার অন্তর্গত) স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সোভিয়েট নেতৃত্বে সমষ্টিগতভাবে শান্তি রক্ষা ছিল ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু, এই শান্তি ফ্রণ্ট দানা বাঁধিবার আগেই ভাঙ্গিয়া গেল। যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে দালাদিয়ার ও চেম্বারলেন শান্তি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য স্পেনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন না, যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন চেকোশ্লোভাকিয়াকে ভাঙ্গিয়া শান্তির জন্য হিটলারের হাতে সমর্পণ করা হইতেছে, যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন জাপানকে বিশ্ব শান্তির জন্য খুসী করা হইতেছে—আসলে তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতাতেই এই দুর্দ্দৈব ঘটিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ফ্রন্ট খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। এক দেশের জনগণের বিরুদ্ধে অন্যদেশের জনগণকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। ব্রিটীশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাদের জনগণকে বলিলেন যে তাঁহারা হিটলারবাদের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু, আসলে তাঁহারা লড়িতেছেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তাহাদের মতলব ছিল হিটলারকে দিয়া সোভিয়েটের উপর আক্রমণ চালান এবং সমগ্র পৃথিবী ভোগ দখলের ব্যাপারে হিটলারকে তাঁহাদের তাঁবেদার সহযোগী করিয়া রাখা। হিটলার ব্রিটীশ এবং ফরাসী ধনিক নেতৃত্বকে চূর্ণ করিয়া স্বীয় নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা চাহিলেন। তিনি জার্ম্মাণ জনসাধারণকে এই মিথ্যা স্তোক বাক্য দিলেন, যে সমগ্র বিশ্বের মালিক ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্থায়ী শান্তির জন্য লড়িতেছেন। আসলে এই যুদ্ধে কোন দেশের জনগণের স্বার্থ ছিল না। সাম্রাজ্যিক শাসকবৃন্দ তাহাদিগকে এই যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রত্যেক দেশেরই অগ্রবর্ত্তী জনগণ এই যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এই যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এমন কি যুদ্ধ বাধিবার পরও প্রাচ্যে বৃটেন এবং ফ্রান্স রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ফিন্‌ল্যাণ্ডকে উত্তেজিত করিয়াও এই চেষ্টা হইয়াছিল, সোভিয়েটের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া জার্ম্মানীর সহিতও পুনর্মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদপসরণ

যুদ্ধের প্রথম ২২ মাসের পরিণতি নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর হওয়ায় বুর্জ্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা ও শাসকবৃন্দ নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে পতিত হইলেন। জার্ম্মানী ও বৃটেনের বিরোধের তীব্রতা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল এবং পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি এক-পক্ষে না হয় অন্যপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হইল। ব্রিটীশ শাসকবর্গ সোভিয়েটের শক্তিহ্রাসের ব্যস্ততায় পশ্চিম ইওরোপের রাষ্ট্র-গুলিকে নিতান্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সমস্ত দেশের শাসন ব্যবস্থায় ইহাঁদেরই সাহায্যে ফ্যাশিবাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের পতন যে এত শীঘ্র ঘটিল তাহার প্রধান কারণ ফ্যাশি-বাদের প্রভাবে এই সকল দেশের জনশক্তি বিশেষভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, অতি শীঘ্রই ইহাদের পতন ঘটিল এবং সমস্ত পশ্চিম ইওরোপের শিল্প সম্পদ ও জনবল হিটলারের হাতের মধ্যে পড়িল। তিনি নার্ভিক হইতে বোর্দ্দো পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূলভাগ অধিকার করিয়া বৃটেন আক্রমণের ভয় দেখাইতে লাগিলেন এবং এখান হইতে ব্রিটীশ জনসাধারণের উপর ধ্বংস ও মৃত্যু বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

পশ্চিম ইওরোপ অধিকার করিয়া হিটলার বল্কান রাষ্ট্র-গুলির দিকে দৃষ্টি দিলেন। এখানকার শাসক শ্রেণীও ব্রিটীশ-

পন্থী ও হিটলার-পন্থী এই দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। হিটলার চাহিতেছিলেন তাঁহার ভক্তদের সহায়তায় এই সকল রাষ্ট্র কবলিত করিবেন আর ব্রিটীশ শাসকবর্গ চাহিতেছিলেন তাঁহাদের অনুরক্তদের দ্বারা জার্ম্মানের বিরুদ্ধে এখানে একটি নূতন ফ্রণ্ট গঠন করিবেন, আর জনসাধারণের ইচ্ছা ছিল সোভিয়েটের সহযোগিতায় শান্তিরক্ষা করা। ব্রিটীশ অনুরক্তেরা সোভিয়েটপন্থী শান্তিকামী জনসাধারণকে দমন করিয়া জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ দুর্ব্বল হইল। ফলে, হিটলারপন্থীদের সাহায্যে অতি সহজেই হিটলার জয়লাভ করিলেন।

হিটলারের এই নূতন জয় মধ্যপ্রাচ্যে ও সুয়েজে ব্রিটীশ-স্বার্থকে বিশেষভাবে বিপন্ন করিয়া ফেলিল। আমেরিকা যুদ্ধের আরও নিকটে আসিল। বৃটেনের সহিত তাহার নৌচুক্তি সম্পাদিত হইল এবং এই সময় হইতেই সে প্রকৃত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। হিটলার জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপানের মধ্যে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া ইহার উত্তর দিলেন। যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী হইল ও তিনটি মহাদেশের জল স্থল ও শূন্যদেশে শক্তির দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল।

যুদ্ধে মিত্রপক্ষের পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটিতে লাগিল এবং বৃটেন আক্রমণের শক্তি হারাইয়া শুধু মাত্র আত্মরক্ষার কার্য্যের মধ্যে যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখিলেন। ব্রিটীশ জনসাধারণ এই সময় নিজেদের স্বাধীনতা বিপন্ন মনে করিতে লাগিল।

মিত্রপক্ষের যুদ্ধে কোনপ্রকার সাফল্যলাভের আশা থাকিল না। তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন যুদ্ধ যাহাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, এই সময়ে তাঁহারা প্রস্তুত হইতে পারেন। আর হিটলারের লক্ষ্য হইল যুদ্ধ যতসম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করা এবং বিশ্বে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করিতে না পারিলে মিত্রপক্ষ প্রস্তুত হইবার সুযোগ পাইবেন এবং অন্যদিক হইতেও বিপদ আসিবে।

হিটলারের সোভিয়েট আক্রমণের কারণ

হিটলারের পক্ষে যুদ্ধের এই অবস্থায় নূতন সঙ্কল্প গ্রহণের প্রয়োজন হইল। তিনি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের বিপদ জানিতেন। তিনি ইওরোপ ভূখণ্ড জয় করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু, পরাজিত জাতিগুলির অসন্তোষ যে-কোন মুহূর্ত্তেই বিপ্লবের আকারে দেখা দিতে পারে। আসলে তিনি আগ্নেয়গিরির উপরেই বসিয়াছিলেন। তিনি ইহাও জানিতেন সোভিয়েটের নেতৃত্বেই শৃঙ্খলিত ইওরোপের মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ হইবে।

আরও কথা বিবেচনা করিবার ছিল, তিনি সমগ্র বিশ্বের আধিপত্য চাহিতেছিলেন। কিন্তু, সোভিয়েটের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিতে তাহা সম্ভব হইবে না। মিত্রপক্ষ পরাজিত হইলেও তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নষ্ট হয় নাই। বৃটেন জয় অথবা ভারতবর্ষ আক্রমণ খুব সহজে হইবে না। তাহার জন্য প্রচুর শক্তিক্ষয় আবশ্যক হইবে। অথচ এই শক্তি ক্ষয় করিয়া লাভ কি। রুশিয়ার লালফৌজের অক্ষুণ্ণ শক্তি সীমান্তে রাখিয়া বিশ্বজয় করিলেও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। সোভিয়েট নেতৃত্বে পৃথিবীর শৃঙ্খলিত জনগণের শক্তির সম্মুখীন তাঁহাকে হইতেই হইবে।

সেদিন তাঁহার সোভিয়েটের বিরুদ্ধতা করিতে হইয়াছে। জার্ম্মানীর বিপ্লব ঠেকাইবার জন্য। বিশ্ববিপ্লব প্রতিরোধের দায়িত্ব সেদিন তাঁহার আসে নাই।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু সোভিয়েট ইউনিয়ন। ব্রিটীশ ও ফরাসীসাম্রাজ্য যখন জার্ম্মান আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় নাই তখন ইহারা সোভিয়েটকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং ফ্যাশিষ্ট শক্তির সাহায্যে এই কণ্টকোদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু, হিটলারের সেদিন সাম্রাজ্য ছিল না, ছিল সাম্রাজ্যের স্বপ্ন ; আর সোভিয়েটের সহিত লড়িবার মত সামরিক শক্তিও তাঁহার ছিল না।

কিন্তু, আজ চাকা সম্পূর্ণ ঘুরিয়া গেল। ইওরোপ মহাদেশ হইতে বৃটেন বিতাড়িত, প্রাচ্য-সাম্রাজ্য বিপদের মুখে। প্রতি রাত্রে জার্ম্মান বোমারুর ধ্বংসলীলার তাণ্ডব চলিতেছে এবং ব্রিটীশ জনসাধারণের কাছে শাসকবর্গের অকর্ম্মণ্যতা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

অন্যদিকে হিটলার তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগীদিগকে কোনঠাসা ও পরাজিত করিয়াছেন। সমগ্র পৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত প্রায়। কিন্তু, তাঁহার সিদ্ধিলাভের পথে এখনও বড় বাধা রহিয়াছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। কাজেই, সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করার প্রয়োজন আজ তাঁহারই বেশী এবং সেইকার্য্যে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের একত্রিত করায় তাঁহারই লাভ। তাহাদের নিকট হইতে আজ আর তাঁহার ভয়ের কারণ নাই। তাঁহাদের অবিসংবাদী নেতৃত্ব তাঁহার হাতে।

আবার সোভিয়েটকে আক্রমণ করিবার সবচেয়ে বড় সুযোগ ও অবসরও এখন। বৃটেনের সহিত যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। এখন

বৃটেনের আক্রমণ করিবার শক্তিও সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত। সমগ্র ইওরোপের জনবল ও সর্ব্ববিধ সম্পদ হিটলারের হাতে। ইও-রোপের সমস্ত কারখানাগুলিতে তাহার জন্য সমর সম্ভার প্রস্তুত হইতেছে। এই সুযোগে সোভিয়েটকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

হিটলার আরও আশা করিয়াছিলেন যে, বৃটেন ও আমেরিকায় ফ্যাশিষ্টপন্থীদের সাহায্যে বৃটেনের সহিত যুদ্ধ হয়ত তিনি আপাতত মিটাইয়া ফেলিতে পারিবেন ও তাহাকে দিয়া এই সময় একযোগে সোভিয়েট আক্রমণের নীতি গ্রহণ করাইতে পারিবেন। অন্ততপক্ষে ইওরোপ আমেরিকার শাসকশ্রেণীকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া রাখিতে পারিবেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার সম্মিলনে ভবিষ্যতে যে বিরাট শক্তির সমাবেশ হইবার আশঙ্কা ছিল সে আশঙ্কা ইহাতে দূরীভূত হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দূত হিসাবে হেসকে ইংলণ্ডে পাঠান হয়।

অনেকে মনে করেন হিটলারের রুশিয়া আক্রমণ বুঝি তাঁহার একটা ব্যক্তিগত খেয়ালমাত্র। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে তিনি তাঁহার দিক হইতে ভাল কাজ করিতেন। কিন্তু, আসলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ব্যতীত তাহার উপায়ান্তর ছিল না। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত খেয়াল নহে, ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ।

সোভিয়েট রুশিয়ার ধ্বংস ব্যতীত জগতে আধিপত্য লাভের তাঁহার সম্ভাবনা ছিল না। ইওরোপের অধীনস্থ জনগণের

অভ্যুত্থানকে ঠেকাইয়া রাখিবার আর কোন উপায় ছিল না। দীর্ঘস্থায়ী দূরপাল্লার যুদ্ধে বৃটেন ও আমেরিকার সহিত লড়িবার জন্য যে খাদ্য, তৈল ও কাঁচামালের প্রয়োজন সোভিয়েট রুশিয়া ছাড়া তাহা আর কোথায় পাওয়া যাইবে ?

তদ্ব্যতীত ব্রিটীশ ও আমেরিকার সম্মিলনে যে বিরাট শক্তি সমাবেশের সম্ভাবনা ছিল তাহাকে তিনি বিশেষ ভয় করিতে-ছিলেন। তিনি সোভিয়েটকে আক্রমণ করিয়া আশা করিতে-ছিলেন, এই ব্যাপার লইয়া ব্রিটীশ শাসকবর্গের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইবে। ফ্যাশিষ্টপন্থীরা দৃঢ়ভাবে এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিবেন যে, এখন যখন হিটলার সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া আর কাজ নাই। হেসকে যে তিনি এই উদ্দেশ্যে বৃটেনে পাঠাইয়া ছিলেন সেকথা চার্চ্চিলও স্বীকার করিয়াছেন।

হিটলার আরও আশা করিয়াছিলেন যে এই ব্যাপার লইয়া আমেরিকার সহিত বৃটেনের বিচ্ছেদ ঘটিবে। কেননা জাপান তখনও আমেরিকা আক্রমণ করে নাই এবং মার্কিণ ফ্যাশিষ্টদের উপর হিটলার আশা পোষণ করিতেছিলেন। সোভিয়েট তাহার পশ্চিম সীমান্তে আক্রান্ত না হইলে জাপানও ফ্যাশিষ্ট অভিযানে নিশ্চিন্ত হইয়া সহযোগিতা করিতে পারে না। এই সব কারণে হিটলারের সোভিয়েট আক্রমণকে আকস্মিক বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই।

অনাক্রমণ চুক্তি বলবৎ থাকাকালে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সোভিয়েটকে আক্রমণ করিয়া হিটলার যে ফল লাভের আশা করিয়াছিলেন ঘটনার গতি সম্পূর্ণভাবে তাহার বিপরীত দিকে গিয়াছে। অকস্মাৎ সোভিয়েটকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাজিত ও চূর্ণ করিয়া ফেলিবার যে আশা করিয়াছিলেন সেই আশা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েটের দুর্ব্বার প্রতিরোধ শক্তি হিটলারের এতদিনের স্বপ্ন নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে।

যুদ্ধের মৌলিক পরিবর্ত্তন

সোভিয়েটের উপর হিটলারের এই আক্রমণের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য হইতেছে যে ইহাতে যুদ্ধের মূল চরিত্র সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এতদিন যুদ্ধ ছিল পৃথিবীর বণ্টন লইয়া দুই দল সাম্রাজ্যবাদীর মধ্যে লড়াই। জার্ম্মাণ বিপ্লবকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য হিটলারের পক্ষে এই অভিযান অপরিহার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ সাম্রাজ্যবাদীগণের শক্তি যখন লুপ্ত হইল এবং সমগ্র পৃথিবী হিটলারের কুক্ষিগত হইবার উপক্রম হইল তখন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু হইল, বিশ্বের জনগণের বিপ্লবের শক্তি ও তাহার আশু সম্ভাবনা। বৈপ্লবিক শক্তির দুর্গ সোভিয়েটকে আক্রমণ করিয়া এই বৈপ্লবিক শক্তিকে তিনি ধ্বংস করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র শক্তি আজ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রতিপক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নহে। তাহাদের সহিত তিনি মিটমাটই চাহিতেছেন।

ইউরোপের পরাজিত জনগণের মনে, নূতন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। সোভিয়েটের ধ্বংস সাধনে হিটলারের ব্যর্থতায় ইউরোপের জনগণের মন আসন্ন মুক্তির আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। খণ্ড খণ্ড বিপ্লবের চেষ্টায় ও ক্রুদ্ধ ফ্যাশিবাদের নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় এই জাগ্রত আগ্নেয়গিরির

আভ্যন্তরীণ উত্তাপের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে বিপুল অগ্ন্যুৎপাতে ইহা ফ্যাশিজমের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।

এতদিন এই যুদ্ধে ইওরোপের জনগণের কোন স্বার্থ ছিল না। যুদ্ধরত দেশের দুর্ব্বলতা ও সঙ্কটের মুহূর্ত্তে মুক্তি লাভই ছিল তাহাদের একমাত্র কাম্য। কিন্তু এই যুদ্ধ আজ সহসা তাহাদের মুক্তি যুদ্ধে পরিণত হইল। যদি সোভিয়েটের জয় হয় তাহা হইলে তাঁহাদের মুক্তি হইবে আর যদি ফ্যাশিজমের জয় হয় এবং সোভিয়েট পরাজিত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয় তাহা হইলে তাহাদের মুক্তির আশা বহুদিনের জন্য নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের যে ধর্ম্মান্তর ঘটিল অধিকৃত ইউরোপের জনগণের কাছে তাহার রূপ সুস্পষ্ট ও আবরণহীন হইয়া দেখা দিল। তাহাদের কাছে ব্রিটীশ অথবা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ভয় ছিল না। ফ্যাশিবাদের কঠোর নিষ্পেষণে তাহারা পিষ্ট হইতেছিল। ফ্যাশিবাদের অপ্রতিহত অভিযানই ছিল তাহাদের শঙ্কা ও নৈরাশ্যের কারণ। ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে সাফল্যপূর্ণ সংগ্রামই যে তাহাদের মুক্তিসংগ্রাম একথা বুঝিতে তাহাদের দেরী হইল না। সোভিয়েট নেতৃত্বে ইউরোপের (আসলে সমগ্র বিশ্বের) মুক্তি সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হিটলার সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করিয়া বিশ্বের গণমুক্তির চেষ্টাকে হত্যা করিতে

চাহিয়াছিলেন। আসলে তাহাদের এই চেষ্টা তাহার কার্য্যের ফলে দানা বাঁধিয়া উঠিবার সুযোগ পাইল।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যতই অগ্রসর হইতেছিল বিভিন্ন উপনিবেশে জাতীয় মুক্তি প্রচেষ্টা ততই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। সাম্রাজ্য-তন্ত্রের সহিত জনগণের সংঘর্ষ দৈনন্দিন ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছিল। যুদ্ধের সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বিপ্লবের শক্তি মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। এতদিন যে যুদ্ধ হইতেছিল উপ-নিবেশিক জনগণ জানিত এই যুদ্ধে তাহাদের বিন্দুমাত্র স্বার্থ নাই। তাহাদিগকে শোষণ করিবার অধিকার লইয়াই এই যুদ্ধ। যে পক্ষই জয়লাভ করুক তাহাতে তাহাদের দাসত্ব ও নিপীড়নের অবসান হইবে না। যুদ্ধের সুযোগে মুক্তির চেষ্টাই তাহাদের একমাত্র করণীয়। হিটলার এই বিপ্লবের শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্যই সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছেন।

যদি ফ্যাশিবাদের জয় হয়, তবে এতদিন ধরিয়া যে মুক্তি প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, বিপ্লবের শক্তি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। নূতন করিয়া অনেক বেশী শক্ত শৃঙ্খল গলায় পরিতে হইবে। আর যদি ফ্যাশিজমের পরাজয় ঘটে তাহা হইলে সোভিয়েটের নেতৃত্বে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধ যতদিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছিল ততদিন এই যুদ্ধে উপনিবেশিক জনগণের কোন স্বার্থ ছিল না। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণের

সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধ তাহাদের মুক্তিযুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। আজ তাহাদিগকে সমস্ত শক্তি দিয়া ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে ; সোভিয়েট রুশিয়ার জয়কে সুনিশ্চিত করিতে হইবে।

এইভাবে যুদ্ধের গুণগত মৌলিক পরিবর্ত্তন বা ধর্ম্মান্তর হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল তুইদল সাম্রাজ্যবাদীর মধ্যে শোষণ ক্ষেত্রের অধিকার লইয়া। কিন্তু সাম্রাজ্যভোগীরা যখন পরাভূত হইয়া কোনঠাসা হইয়া পড়িল, তখন সাম্রাজ্য লোভী ফ্যাশিষ্টরা দেখিতে পাইল পৃথিবীতে তাহাদের আধিপত্য কায়েম করিবার পথে বাধা জন্মাইবার ক্ষমতা সাম্রাজ্যভোগীদের আর নাই। আসলে পৃথিবীভোগের পথে তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদের উৎস হইতেছে সোভিয়েট রুশিয়া এবং তাহার পশ্চাতে তুনিয়ার সংঘবদ্ধ জনগণ। সোভিয়েটকে আক্রমণ করিয়া হিটলার এই বিপদের উৎসমুখ অবরুদ্ধ করিতে চাহিলেন।

অন্যদিকে পৃথিবীর জনগণও সোভিয়েট রুশিয়াকে তাহাদের মুক্তি যুদ্ধের নেতা বলিয়া জানিতেন। সোভিয়েট রুশিয়া আক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিপদ বুঝিতে পারিয়া ঐক্য ও দৃঢ় সঙ্কল্পের অটুট শক্তিসহ সোভিয়েট রুশিয়ার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছে। আর ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যভোগীরা নিজ নিজ দেশের জনগণের চাপে সোভিয়েট নেতৃত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

এইভাবে যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল সেই যুদ্ধ জনগণের মুক্তি যুদ্ধে ধর্ম্মান্তরিত হইল। বিপ্লবকে ধ্বংস

করিবার জন্য প্রতিবিপ্লবের নেতা হিটলার সোভিয়েটকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, বিপ্লবী জনগণের শক্তিপুষ্ট সোভিয়েটের বিপুল সামরিক শক্তি প্রতিদিন ফ্যাশিষ্টদের সমাধি খনন করিতেছে। জাপান এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া একদিকে বিশ্ব-ফ্যাশিষ্টদের যোগাযোগকে সম্পূর্ণ করিয়া দিল, অন্যদিকে প্রাচ্যখণ্ডে ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করিয়া পৃথিবীর জনগণকে সম্মিলিত করিয়া দিল। আজ একদিকে বিশ্ব-ফ্যাশিষ্টদের সম্মিলিত অভিযান সমগ্র পৃথিবীকে কবলিত করিতে চাহিতেছে। আর অন্যদিকে সমগ্র অধিকৃত ইওরোপের ক্ষুব্ধ জনগণ, চীন ও ভারতবর্ষের বিরাট গণবাহিনী, বৃটেন ও আমেরিকার জনগণের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সোভিয়েটের নেতৃত্বে ফ্যাশিষ্ট অভিযানকে বাধা দিবার জন্য বিরাট লৌহ-প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে। পৃথিবীর সম্মিলিত এই গণবাহিনীর জয় প্রতিদিন নিশ্চিত হইতে নিশ্চিততর হইতেছে।

যুদ্ধের গতি জনগণের পক্ষে

যুদ্ধের এই পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করিয়া হিটলার অন্যত্র যে ফলাফলের আশা করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার কল্পনানুযায়ী হয় নাই। হিটলার মনে করিয়াছিলেন, যুদ্ধের এই গুণগত পরিবর্ত্তনের ফলে বৃটেন ও আমেরিকা, ব্রিটিশ ও মার্কিন ফ্যাশিষ্টদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া হিটলারের পক্ষে যোগ দিবে। আর যোগ না দিলেও মতবিরোধের ফলে তাহাদের শক্তি ক্ষয় হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ কি হইল ?

ব্রিটীশ ও ফরাসী ফ্যাশিষ্টপন্থীরা যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে ফ্যাশিষ্ট চক্রে যোগ দিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া যখন যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হইলেন, তখন তাঁহাদের মনে আশা ছিল, যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহা সম্ভব হয় নাই, যুদ্ধের মধ্যে তাহা সম্ভব হইতে পারে। তাঁহারা ফ্যাশিষ্টদের আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্য বাঁচাইতে ইচ্ছুক ছিলেন বটে, কিন্তু, তাঁহারা জাগ্রত জনগণের শক্তি ও সোভিয়েট রুশিয়াকে সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে বৃহত্তর বিপদ বলিয়া মনে করিতেছিলেন।

যুদ্ধ সম্বন্ধে দুইটি নীতির উপর তাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন। এক হইতেছে জনগণের জাগ্রত শক্তিকে দূরে রাখিয়া কোন রকমে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া। আর হইতেছে সোভিয়েট রুশিয়াকে কোন রকমে যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলিয়া সাম্রাজ্য-

বাদীদিগের সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের পথ সুগম করা। তাঁহাদের দুই চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়।

প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইবার কারণ, তাঁহারা পৃথিবীকে ফ্যাশিষ্টদের সহিত ভাগাভাগি করিয়া লইতে কতকটা রাজী থাকিলেও, হিটলার তাঁহাদের দুর্ব্বলতার সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ব তাঁহার হাতে আসিবার পূর্ব্বে তিনি মিটমাটের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি পৃথিবীর একাধিপত্য চাহিতেছিলেন এবং তাহার জন্য ব্রিটীশের নিকট হইতে বশ্যতা স্বীকার চাহিতেছিলেন। এই বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য বিদ্যুৎগতি আক্রমণ করিয়া ও জনগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক বিস্তার করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন।

ফরাসী পদানত হইবার পর বৃটেনের বিপদ আসন্ন হইয়া উঠিল। ব্রিটীশ জনগণের কাছে ফ্যাশিষ্টদের হাত হইতে স্বাধীনতা রক্ষাই বড় প্রশ্ন হইয়া উঠিল। জার্ম্মাণ বোমারুর ধ্বংস লীলা ব্রিটীশ জনসাধারণকে গভীর ভাবে ফ্যাশিবিরোধী করিয়া তুলিল। ফ্যাশিবিরোধের প্রবল তরঙ্গ সমগ্র বৃটেনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। যে কোন মূল্যে ফ্যাশি-অভিযানকে ঠেকাইতে হইবে। অকর্ম্মণ্যদের ক্ষমতার আসন হইতে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। ফ্যাশিষ্ট সহানুভূতি সম্পন্নদের নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। ইহাই হইল ইংলণ্ডের জনসাধারণের সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট দাবী।

চেম্বারলেনের হাত হইতে যুদ্ধের নেতৃত্ব চার্চ্চিলের হাতে চলিয়া গেল। গ্রেট বৃটেনের ফ্যাশিষ্ট পন্থীরা ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে পরাভূত হইলেন। হিটলারের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ হইল না। হেসের দৌত্য এই কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল। জনগণের তীব্র ফ্যাশিবিরোধী মনোভাবের সামনে দাঁড়াইয়া হিটলারের সহিত মিটমাটের কথা বলিবার সাহস ও ক্ষমতা কোন শাসকেরই ছিল না।

ইহার ফল কি হইল? ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা অকপটভাবে ফ্যাশিবিরোধী ছিলেন অর্থাৎ যাঁহারা হিটলারের সহিত সাম্রাজ্য ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতে রাজী ছিলেন না, তাঁহাদেরই হাতে অনেকটা ইংলণ্ডের শাসনযন্ত্র চলিয়া আসিল। ফ্যাশি অনুরাগীরা বহুল পরিমানে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিহীন হইয়া পড়িলেন। এই যে অবস্থান্তর আরম্ভ হইল যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্‌কে গ্রহণ এবং মন্ত্রিসভা হইতে বিভারব্রুকের নিষ্কাষনে তাহার আধুনিক পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।

ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণীর মধ্যে সোভিয়েটের সহিত মৈত্রী সম্পর্কে মতবিরোধ, গ্রেটবৃটেনকে হিটলারের অভিপ্রায় অনুযায়ী দুর্ব্বল না করিয়া সবল করিয়া তুলিল। প্রথমত ফ্যাশিষ্টপন্থীরা ক্ষমতার আসন হইতে বহুস্থানে বিতাড়িত হওয়ায়, ইংলণ্ডের রাষ্ট্র ও সামরিক ব্যবস্থা আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা হইতে অনেক মুক্ত হইতেছে এবং ফ্যাশিবিরোধী শাসক শ্রেণীর সহিত ফ্যাশিবিরোধী জনগণের যোগাযোগ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হইতেছে।

ইংলণ্ডের ধনিক গোষ্ঠী এইভাবে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ায়, ফ্যাশিবিরোধী শাসকবর্গকে বাধ্য হইয়া জনগণের মধ্যেই শক্তির সন্ধান করিতে হইতেছে। যুদ্ধের চাপ যত বাড়িতেছে ফ্যাশিবিরোধী জনগণের হাতের মধ্যে ততই বেশী করিয়া ইহারা পড়িতেছেন। জনগণের ঐক্য ও ফ্যাশিষ্টদিগকে ধ্বংস করিবার সংকল্পই একমাত্র শক্তির উৎস। দ্বিধাবিভক্ত শাসকশ্রেণী এই উৎসমুখকে অবরুদ্ধ রাখিয়া ফ্যাশিবাদের সহিত সংগ্রাম চালাইতে পারেন না। তাই ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ আজ ব্রিটীশ জনগণের শিবিরে বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা ফ্যাশিবাদের বিরোধী অথচ যুদ্ধের পরে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য স্থায়ী হইবে, এই ভয়ে ভীত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছেন, বৃটেনের আভ্যন্তরীণ এই পরিবর্ত্তনের কথা তাহাদিগকে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে।

ব্রিটীশ ফ্যাশিবিরোধী শাসকবর্গ অবশ্য চাহেন নাই যে, তাঁহারা জনগণের হাতের মধ্যে গিয়া পড়েন। অথবা তাঁহারা ইহাও চাহেন নাই যে, ব্রিটীশ জনগণের ফ্যাশিবিরোধী মনোভাব সোভিয়েটের উপর প্রীতিতে গিয়া পৌছায়। তাঁহারা হিটলারের হাত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে চাহেন। বিশ্ব বিপ্লবের কাছে সাম্রাজ্য হারাইতে চাহেন না। কিন্তু, ঘটনার গতি তাঁহাদের ইচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ফ্যাশিবাদের হাত হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের শাসকবর্গকে দেশের মধ্যে তীব্র ফ্যাশিবিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিবার জন্য

চেষ্টা করিতে হইয়াছে। প্রেস রেডিও, বক্তৃতামঞ্চ প্রভৃতি প্রচারের সমস্ত কেন্দ্র হইতে ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরতা ও ফ্যাশিষ্টদের কুকীর্ত্তির কথা প্রচারিত হইয়াছে। বৃটেনের স্বাধীনতা বিপন্ন, একথা দিনের পর দিন ব্রিটীশ জনসাধারণকে জানান হইয়াছে এবং ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্রিটীশ জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

ব্রিটীশ জনসাধারণের উপর ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াও হইয়াছে। ব্রিটীশ সামরিক শক্তি যে নিতান্ত অন্তঃসারশূণ্য হইয়া পড়িয়াছে একথার আকস্মিক প্রমাণ ব্রিটীশ জনসাধারণকে বিমূঢ় ও বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের মালিক বলিয়া যাহাদের গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্যের সীমা ছিল না, তাহারা যখন নিজেদের জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিল তখন তাহাদের আহত আত্মাভিমানের প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়।

লণ্ডন নগরী সমগ্র ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি। প্রত্যেক বৃটেনবাসীর মনে লণ্ডন সম্পর্কে গৌরব ও মমতা বোধ রহিয়াছে। পৃথিবী লুণ্ঠন করিয়া ইহার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করা হইয়াছে। সেই লণ্ডন নগরী বিস্ফোরণ ও অগ্নির মুখে নিতান্ত অসহায়ভাবে ধ্বংস হইতেছে, আর ঐতিহাসিক গৌরবের বস্তুগুলি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতেছে। নাগরিকদের— নারী শিশু ও বৃদ্ধের বিকলাঙ্গ ও মৃতদেহে লণ্ডন ও অন্যান্য ছোট বড় নগরীর রাজপথ সমাচ্ছন্ন হইতেছে। এই অভিজ্ঞতা

বৃটেনবাসীর পক্ষে যেমন অভিনব, তেমনি অপ্রত্যাশিত। ফ্যাশিবিরোধী তীব্র মনোভাবের প্রাচীর ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জে গড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নই লোকের মনে সব চেয়ে বড় হইয়া দেখা দিল। কি উপায়ে ব্রিটীশ দ্বীপ-পুঞ্জের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়, কে আজ ফ্যাশিষ্ট দস্যুর নিধনে ব্রিটীশ জনসাধারণের সহযোগী হইবে, এই প্রশ্ন বৃটেনের প্রতিটি অধিবাসীর মনে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

নৈরাশ্যের অন্ধকার যখন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে আশার ক্ষীণ আলোক রেখাও যখন দেখা যাইতেছে না চরম সঙ্কটের জন্য যখন ব্রিটীশ জাতি প্রস্তুত হইতেছে, তখন অকস্মাৎ হিটলার রুশিয়াকে আক্রমণ করিল। অকস্মাৎ আশার আলো দেখা দিল, ব্রিটীশ জনসাধারণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

এই অবস্থায় কোন শাসকবর্গের সাধ্য ছিল না যে৷ সোভিয়েট রুশিয়ার মৈত্রীকে তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন তেইশ বৎসরের বিরোধী নীতি পরিত্যক্ত হইল, চার্চ্চিল সোভিয়েটকে সামরিকমিত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সোভিয়েটের উপর প্রতিকূল মনোভাব তিনি গোপন করিলেন না। জনসাধারণ যাহাতে সোভিয়েটের দিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে, তাহাই ছিল তাঁহার আসল উদ্বেগ।

কিন্তু, জনসাধারণ রুশিয়ার সহিত মৈত্রীকে যান্ত্রিকভাবেমাত্র সামরিক মৈত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। জনসাধারণ তাহা পারেও না। বিপদের দিনে যে সহযোগিতার

ও বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল ; নিজের মাথার উপর বিপদের ভার লইয়া তাহাদের বিপন্মুক্ত করিয়া দিল, শুধুমাত্র একটি স্থানে তাহার সহিত সম্পর্ক থাকিবে, অন্যস্থানে কোন সংযোগ থাকিবে না, এই প্রকার ধরাবাঁধা রাস্তা ধরিয়া জনগণ অগ্রসর হইতে পারে না।

ইংলণ্ডের জনগণের কাছে সোভিয়েট রুশিয়া মুক্তিদাতা রূপে দেখা দিল। ইংলণ্ডের আকাশ হইতে ঘন কাল ঝড়ো মেঘ এক মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল। চার্চ্চিল প্রমুখ শাসকবর্গের ইচ্ছা না থাকিলেও সোভিয়েটের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় ইংলণ্ডবাসীর মন ভরিয়া গেল। তাহার পর যখন অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে নাৎসী অভিযানের অপ্রতিহত গতি পূর্ব্ব ইওরোপের রণক্ষেত্রে লালফৌজ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইল, তখন ইংলণ্ডবাসীরা সমস্ত জগতের সহিত যুদ্ধ জয়ের জন্য একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়ার দিকে তাকাইতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, দুর্দ্দান্ত নাৎসী বাহিনীকে একমাত্র সোভিয়েটের গণবাহিনীই প্রতিরুদ্ধ ও পরাভূত করিতে সমর্থ। হিটলারের যদি পরাজয় ঘটে, তবে একমাত্র সোভিয়েটের হাতেই ঘটিবে।

তাই ধ্বনি উঠিল,—সোভিয়েটকে দ্রুত সাহায্য কর, আরও দ্রুত, আরও বেশী। আরও ট্যাঙ্ক, আরও এরোপ্লেন আরও অন্যান্য সমর-সম্ভার দাও। ইংলণ্ডের অধিবাসীরা অবিরাম দাবী করিতেছে, ইওরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি কর, রুশিয়ার উপর হইতে চাপ কমাও, রুশিয়ার জয়ের পথ নির্ব্বিঘ্ন কর।

রুশিয়ার জয়ে সবার জয়। রুশিয়ার পরাজয়ে বিশ্বের গণশক্তির পরাজয়।

ইংলণ্ডের শ্রমিকগণ ট্যাঙ্ক সপ্তাহ পালন করিতেছে। উৎপাদন বাড়াইবার জন্য দ্রুত হাত চালাইতেছে। বৃটীশ মন্ত্রিসভাতে রুশিয়াকে যথাযথ সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতির কেবলই পুনরাবৃত্তি করিতে হইতেছে। তাহার দ্বারা জনমতের চাপ যে কতটা তাহা কিছু পরিমানে বুঝা যাইতেছে। সোভিয়েটের প্রতিটা জয়, প্রতিটি বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ, ইংলণ্ডবাসীরা আনন্দে ও গৌরবে অভিনন্দন করিতেছে। উৎকণ্ঠায় ও উদ্বেগে তাহার দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতেছে। আর যুদ্ধের চাপে, প্রস্তুতির প্রয়োজনে, ইংলণ্ডের শাসকদের প্রতিদিন এই জনগণের হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইতেছে।

চার্চ্চিল, যেদিন প্রথম বলিয়াছিলেন, সোভিয়েটের সহিত সামরিক মৈত্রী হইলেও, সাম্যবাদের সহিত কোন মৈত্রী হয় নাই,—সেইদিন এবং যেদিন কুড়ি বৎসরের জন্য ইঙ্গ-সোভিয়েট পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল—এই দুই দিনের পার্থক্য সকলের কাছেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ইংলণ্ডের এই যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমেরিকাতেও অনুরূপ ব্যাপারের সংঘটন হইতেছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমেরিকার ধনিক গোষ্ঠীর মধ্যেও ফ্যাশিষ্টপন্থী ও ফ্যাশিবিরোধী বিভাগ রহিয়াছে। সোভিয়েটের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাতেও ক্ষমতা লাভের জন্য উভয়

দলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। এই বিরোধ এখানে ইংলণ্ডের মত তীব্র আকারে দেখা না দিলেও রুজভেল্টকে অনেক বাধাবিপত্তি জয় করিয়া সোভিয়েট গণতন্ত্রের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছে।

অনেকে ফ্যাশিবাদকে বিশ্বের শত্রু ও মানবতার শত্রু বলিয়া মনে করিতেছেন অথচ, আশঙ্কা করিতেছেন, যুদ্ধে মিত্র পক্ষ জয়লাভ করিলেও উপনিবেশিক দেশ সমূহের বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। সেখানে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ড ও আমেরিকার এই গুরুতর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের কথা তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে। কোন ব্যবস্থা একদিনে ভাঙ্গিয়া পড়ে না। ভাঙ্গিয়া পড়িবার পূর্ব্বে দৃষ্টির অন্তরালে ভাঙ্গিবার আয়োজন চলিতে থাকে। ঘটনার দ্রুত আবর্ত্তনে এই বৈপ্লবিক শক্তিও দ্রুত তালে অগ্রসর হইতেছে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ভাগ্য-গণনায় এই শক্তির ক্রিয়াকে উপেক্ষা করিলে বিশেষ ভাবে ভুল করা হইবে।

সোভিয়েটের জয়ে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ

যুদ্ধের এই গুণগত পরিবর্ত্তন ঘটিলেও উপনিবেশ সমূহের অধিবাসীদের মনে এই সন্দেহ আজও ঘুচে নাই যে, যুদ্ধের শেষে তাঁহাদের মুক্তি না মিলিতেও পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতবর্ষের কথা বলা যায়। আমাদের অনেক লোকের মনে এখনও এই সন্দেহ আছে যে, ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যাঁহারা লড়িতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যেমন সোভিয়েট রুশিয়া আছে, তেমনি বৃটেন ও আমেরিকা আছে। যুদ্ধের শেষে ইহারা নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন এবং সোভিয়েট তাহাতে কার্য্যত বাধা দিতে সমর্থ হইবে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহারা গত যুদ্ধের সময় ব্রিটীশ প্রতিশ্রুতি এবং যুদ্ধের পরে তাঁহাদের আচরণের কথা উল্লেখ করেন।

কিন্তু, গতযুদ্ধের সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্যের কথা মনে রাখিলে ইহারা আর এই ভ্রমে পতিত হইবেন না। গতযুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, পৃথিবীর ভাগ বাটোয়ারাই ছিল যুদ্ধের লক্ষ্য, কাজেই তাহার পরিণতিও তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে নাই। এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরূপে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু, বর্ত্তমানে ইহা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নহে। ইহার এক পক্ষ চাহিতেছে পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করিতে এবং বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নষ্ট করিতে। শোষিত জনগণের শক্তির

দুর্গ, সোভিয়েটের উপর সেই জন্য আক্রমণ হইয়াছে। আর অন্য পক্ষে রহিয়াছে সোভিয়েটের নেতৃত্বে পৃথিবীর মুক্তিকামী জনগণ। তাহাদের লক্ষ্য হইতেছে বিশ্বের জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতা।

প্রশ্ন জটিল হইয়া উঠিয়াছে সোভিয়েটের পক্ষে বৃটেন ও আমেরিকা রহিয়াছে বলিয়া। এই অসম মিলন কি ভাবে সংঘটিত হইল তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার আরও একটু বিস্তৃত আলোচনা করা চলিতে পারে। আমাদের দেখা প্রয়োজন, যুদ্ধের নেতৃত্ব মিত্রপক্ষে কাহার হাতে রহিয়াছে। বৃটেনের হাতে যে নাই তাহা খুবই সুস্পষ্ট। এই যুদ্ধের সামরিক নেতৃত্ব নিঃসন্দেহ সোভিয়েট রুশিয়ার হাতে রহিয়াছে। অপর পক্ষে যুদ্ধের নেতৃত্ব রহিয়াছে হিটলারী জার্ম্মানীর হাতে। ফাশিষ্ট শক্তি তাহারই হাতে কেন্দ্রীভূত। বৃটেনের সহিত শক্তি পরীক্ষা তাহার এক প্রকার শেষ হইয়াছে। অবশিষ্টটুকুর জন্যে সে জাপানের উপর ও আফ্রিকায় ইটালীর উপর ভার অর্পণ করিয়াছে। প্রধান বাহিনীকে প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছে। অর্থাৎ এই যুদ্ধে ফ্যাশিষ্টদের জয় পরাজয় রুশ-রণাঙ্গনে নির্দ্ধারিত হইবে, অন্য কোথাও নহে। এপক্ষও যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রধানত সোভিয়েট শক্তির উপর নির্ভর করিতেছেন। প্রাচ্যের যুদ্ধেও প্রধান নেতৃত্ব বৃটেনের হাতে নাই; একদিকে চীনের গণবাহিনীর উপর, অন্য দিকে আমেরিকার উপর রহিয়াছে। সমগ্রভাবে সামরিক নেতৃত্ব রহিয়াছে

সোভিয়েটের উপর, কাজেই শান্তি বৈঠকেও তাঁহারা এই নেতৃত্ব করিবেন।

তাহার পর রাজনীতিক নেতৃত্বের কথা। এই যুদ্ধে মিত্র-পক্ষে কোন্ রাজনীতিক আদর্শ সক্রিয় ভাবে কাজ করিতেছে তাহা পূর্ব্বে কতকটা বলা হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীরা বাধ্য হইয়া সোভিয়েটকে সহযোগীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের জনগণকে সোভিয়েটের প্রভাব হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পারেন নাই। সোভিয়েটের আদর্শ ও প্রভাব, সমস্ত দেশকেই উদ্বুদ্ধ করিতেছে। উপনিবেশিক জনগণের যে মুক্তি প্রচেষ্টা, তাহাও সোভিয়েটকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। দুইটি বিপরীত ধর্ম্মী জিনিষ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা উভয়েই স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। হয় উভয়ে উভয়ের গুণ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়, না হয় একে অপরের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। সোভিয়েট তাহার আদর্শ হইতে এক তিলও সরিয়া আসে নাই। সাম্রাজ্যবাদকেই প্রতিদিন সোভিয়েট আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইতেছে।

এই যুদ্ধে ফ্যাশিজমের যদি জয় হয়, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী সংঘবদ্ধ বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের কবলিত হইবে। ফ্যাশিষ্ট জার্ম্মানী হইবে তাহার নেতা আর অন্যেরা হইবে তাহার ক্ষুদে অংশীদার। আর সোভিয়েট রুশিয়ার যদি জয় হয়, তাহা

হইলে সাম্রাজ্যবাদের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং বিশ্বমুক্তিকে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

শান্তি বৈঠকে কে নেতৃত্ব করিবে? সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুদ্ধের সময়ে যাহাদের হাতে রহিয়াছে, শান্তি বৈঠকেও যে তাহারা নেতৃত্ব করিবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? গত যুদ্ধের নেতরাই শান্তিবৈঠকের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। শান্তি বৈঠকের নেতা যদি সোভিয়েট হয়, তাহা হইলে সেই বৈঠকে নিশ্চয়ই উপনিবেশ ভাগ বাটোয়ারার কথা উঠিবে না। সমগ্র বিশ্বের মুক্তি প্রস্তাবই উঠিবে।

এই সময় ব্রিটীশ শাসকবর্গ যদি সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করেন, তবুও সেই ইচ্ছাকে কার্য্যকরী করিবার মত শক্তি তাঁহারা কোথায় পাইবেন? তাঁহাদিগকে পৃথিবীর সংঘবদ্ধ জনমতের সম্মুখীন হইতে হইবে। তাঁহাদের নিজের দেশের জনমতের নিকট হইতে সোভিয়েট বিরোধী নীতির ক্ষীণ সমর্থন পাইবার আশাও তাঁহাদের নাই। বরং তীব্র বিরোধিতা পাইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। তদুপরি ফ্যাশিবিরোধী মনোভাবকে কেন্দ্র করিয়া এবং জনযুদ্ধের আবর্ত্তে পড়িয়া সমগ্র উপনিবেশে, যে প্রবল মুক্তি প্রচেষ্টা দানা বাঁধিবে, যে সংগ্রামশীল ঐক্য গড়িয়া উঠিবে, তাহা সাম্রাজ্যবাদের কাছে নিশ্চয়ই মাথা নত করিবে না।

যুদ্ধ কিভাবে শেষ হইবে

যুদ্ধশেষে কি প্রকার ব্যবস্থা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার কথা বলা হইল। যুদ্ধ কিভাবে শেষ হইবে তাহাও এই প্রশ্নের সমাধানে সহায়তা করিবে, দুইটি পালোয়ানের মধ্যে যে ভাবে মল্লক্রীড়া সম্পন্ন হয় এ যুদ্ধে জয় পরাজয় সে ভাবে ঘটিবে না। যে সকল শক্তির সক্রিয়তার কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সমবেত চেষ্টার ফলেই যুদ্ধে সোভিয়েট রুশিয়ার বা মিত্রপক্ষের জয়লাভ ঘটিবে। এই যুদ্ধে ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন দুনিয়ার ভাগ্য নির্নীত হইবে, তেমনি ইওরোপের গণজাগরণের বন্যায় পৃথিবী প্লাবিত হইবে।

যুদ্ধে সোভিয়েট রুশিয়া জড়াইয়া পড়ায় ইওরোপের ফ্যাশিষ্ট কবলিত জনগণের মনে যে আশার সঞ্চার হইয়াছে, যে বিপ্লবের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছে, ফ্যাশিষ্ট সৈন্যদলের পরাজয়ের সূচনায় তাহা বিপুল বিপ্লবের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে। কাহারা এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করিবে? ইওরোপের অধিকৃত দেশগুলিতে ফ্যাশিষ্টপন্থীরাই হিটলারের তাঁবেদার হিসাবেই জনগণের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। ব্রিটীশপন্থী বেশীর ভাগ হয় পলায়িত, না হয় বিতাড়িত না হয় স্বদেশের শোচনীয় দুরবস্থার অসহায় দর্শক। তাঁহাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। ইহারা যে জনগণের নেতৃত্বে জাতীয় ফ্রণ্টে যোগদান

করিবেন তাহার আভাস এই সকল লণ্ডনস্থ সরকারগুলির সোভিয়েটের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। এ সকল দেশের একদিকে রহিয়াছে শৃঙ্খলিতহস্তপদ রুদ্ধকণ্ঠ জনগণ, আর এক দিকে রহিয়াছে হিটলার তাঁবেদার ফ্যাশিষ্ট শাসকবৃন্দ। ফ্যাশিজমের অবসানের সঙ্গে এই সকল দেশের নেতৃত্ব অন্য কোন ধনিক দলের হাতে যাইতে পারিবে না। জনগণই দেশের শাসন ভার গ্রহণ করিবেন। এই বিপ্লবী জনগণের উপর আবার কোন শোষণ ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া যাইবে না। শাসন ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা স্থাপনে, রাষ্ট্রগঠনে সোভিয়েটের আদর্শ ইহাদের মধ্যে কাজ করিবে, সোভিয়েটের সবল বাহু ইহাদের সহায়তা করিবে।

খাস জার্ম্মানীতে পরাজয়ের সময় ঘটনা প্রবাহ কোন পথে অগ্রসর হইবে তাহাও এ প্রসঙ্গে বিবেচনার যোগ্য। এই যুদ্ধ যে ফ্যাশিবাদকে নির্ম্মূল করিবার জন্য লড়া হইতেছে সে সম্বন্ধে যুদ্ধরত দেশগুলির মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু ফ্যাশিজমের অবসানের পর জার্ম্মানীতে আর কোন ধনিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? ফ্যাশিবাদ পরাজিত ও নির্ম্মূল হইবে বটে কিন্তু জার্ম্মান জনসাধারণের বিলোপ ঘটিবে না। এই জার্ম্মান জনসাধারণের মধ্যে কি প্রকারের রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে দেখা যাক। ফ্যাশিবাদ জার্ম্মানীর বহুলোককে আচ্ছন্ন করিয়াছে বটে, কিন্তু সকলকে সে ভুলাইতে পারে নাই। জার্ম্মানীর বন্দীশিবির ও তাহার অধিবাসীদের সংখ্যায় তাহার

আভাস পাওয়া যাইবে। আজ জার্ম্মানীতে তাহারা কেহ বন্দী হইয়া আছে, যাহারা বাহিরে আছে তাহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ, কাজ করিবার সুযোগ অপহৃত, একথা সত্য হইলেও সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে তাহারা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে এবং এই সুযোগ মিলিবারও আর খুব বেশী দেরী নাই।

হিটলার জার্ম্মানীর জনসাধারণকে অনেক মিথ্যা আশ্বাস দিয়াছে, অনেক মিথ্যা আশার বাণী শুনাইয়াছে। কিন্তু পরাজয় যখন আসন্ন হইয়া আসিবে তখন জার্ম্মান জনসাধারণের এই মোহ ভাঙ্গিয়া যাইবে। এত রক্তদান, এত দুঃখবরণ, এত বীরত্ব সবই যখন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে, তখন সেই নিদারুণ ব্যর্থতা বিপ্লবের আকারে ফাটিয়া পড়িবে। বাহিরের আঘাতে চূর্ণ হইবার আগেই, ভিতর হইতে এই নির্ম্মম আঘাত ফ্যাশিবাদের ভাগ্যলিখন, তাহার অলঙ্ঘ্য পরিণতি। আজ যাহারা বন্দী শিবিরে কাল যাপন করিতেছে অথবা বাহিরে নিষ্ক্রিয় হইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহারাই হইবে বিপ্লবের অধিনায়ক এবং এই বিপ্লবী জনসাধারণ জার্ম্মানীর পুনর্গঠনে সোভিয়েটের সর্ব্বপ্রকার সহায়তা পাইবে।

গত যুদ্ধে কোন আদর্শের সংঘাত ছিল না। উপনিবেশের ভাগ-বাটোয়ারাই ছিল তাহার প্রধান প্রশ্ন। বিজয়ী পক্ষ জার্ম্মান ধনিকতন্ত্রকে নির্ম্মূল করিতে চাহেন নাই বা পারেন নাই। জার্ম্মান জনসাধারণের উপরও তাহাদের কোন সহানু-ভূতি ছিল না। জার্ম্মানীর গণবিপ্লবকে দমন করিবার জন্য

মিত্রপক্ষের বিজয়ী বাহিনী জার্ম্মানীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিল। যে কোন গণঅভ্যুত্থানকে তাহারা পিষিয়া মারিত।

গত যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষের লক্ষ্য ছিল, জার্ম্মান ধনিক গোষ্ঠিকে তাঁবেদার করিয়া রাখা; তাহাদের নিকট হইতে উপনিবেশ কাড়িয়া লওয়া এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহাকে পঙ্গু করিয়া রাখা। কিন্তু এবার মিত্র পক্ষে সোভিয়েট রুশিয়া থাকায় এবং বিশেষ করিয়া যুদ্ধের নেতৃত্ব তাহার হাতে থাকায় অবস্থা সম্পূর্ণ উল্‌টাইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধ বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের মধ্যে। এই যুদ্ধ সংহত ধনিকতন্ত্র এবং ঐক্যবদ্ধ গণশক্তির মধ্যে। কাজেই যখনই প্রতিবিপ্লব পশ্চাদপসরণ করিবে তখনই বিপ্লব মাথা তুলিয়া দাড়াইবে; ধনিকতন্ত্রের অবসানের সঙ্গেই নূতন সমাজ ব্যবস্থা তাহার স্থান অধিকার করিবে।

সোভিয়েট রুশিয়া কোন দেশ বা জাতিকে এক ও অখণ্ড বলিয়া মনে করে না। জার্ম্মান ফ্যাশিবাদ ও জার্ম্মান জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্য সে জানে; সে ফ্যাশিবাদ এবং ধনবাদকে মুছিয়া ফেলিতে চায় বটে, কিন্তু জার্ম্মান জনসাধারণের উপর প্রতিহিংসা পরায়ণ হইবার বা তাহাদের ছোট ও খর্ব্ব করিয়া রাখিবার প্রয়োজন সোভিয়েটের নাই। জার্ম্মান-সোভিয়েটকে সে সাদরে এবং সানন্দে অভিনন্দন জানাইবে।

সুতরাং এবারকার শান্তি বৈঠক গতবারের শান্তি বৈঠকের ন্যায় হইবে না এবং সোভিয়েট রুশিয়াকে পার্লামেণ্টারী

পদ্ধতিতে পৃথিবীর জাতি সমূহের স্বাধীনতা প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইতে হইবে না। সোভিয়েটের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং সোভিয়েটের সাহায্যে পুষ্ট জনগণ নিজের হাতেই তাহা গড়িয়া তুলিবে। কাজেই শান্তি বৈঠকের সম্মুখে এই প্রশ্ন থাকিবে না যে তাহারা সোভিয়েটের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন বা প্রত্যাখ্যান করিবেন। তাহাদের সম্মুখে প্রশ্ন থাকিবে বিশ্বের সংঘবদ্ধ গণশক্তির সহিত তাহারা শক্তি পরীক্ষায় প্রস্তুত আছেন কিনা। যাহারা এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েটের নেতৃত্ব থাকিবে বলিয়া বিশ্বাসী নহেন, তাঁহারাও ঘটনাপ্রবাহের এই পরিণতি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

যদি এই সময়ে সোভিয়েট নেতৃত্বে পরিচালিত সমগ্র এশিয়া ও ইওরোপের সম্মিলিত গণবাহিনীর সম্মুখীন হইবার ইচ্ছা তাহাদের থাকে, তাহা হইলেও গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকার জনসাধারণ তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। অর্থাৎ এই অবস্থায় তাহাদিগকে একই সঙ্গে নিজ দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হইবে। এই সম্ভাবনা যে নাই, তাহা না বলিলেও চলিবে।

বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ বিলুপ্ত হইবে

পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাতে দেখান হইয়াছে যে ফ্যাশিবাদের পরাজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ব বর্ত্তমানে বৃটেনের হাত হইতে ফ্যাশিষ্ট জার্ম্মানীর হাতে গিয়াছে। বৃটেন আজ ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের পঙ্গুদেহভারকে বহন করিতেছে মাত্র। কাজেই ফ্যাশিবাদের ধ্বংসে, সাম্রাজ্যবাদের সুনিশ্চিত অবসান ঘটিবে।

বিপ্লবের মধ্যে যুদ্ধ যে ভাবে শেষ হইবে বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা যদি নাও হয়, যদি সোভিয়েটের সহিত ইওরোপের জনগণের সহযোগিতার দ্বারা মাত্র নাৎসী বাহিনীর পরাজয়ের ফলেই মিত্র পক্ষের জয় লাভ হয়, তাহা হইলেও জার্ম্মানীতে এবং সমগ্র ইওরোপখণ্ডে কি প্রকারের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

ফ্যাশিবাদের ধ্বংসই মিত্র পক্ষের সকলে যুদ্ধের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই হিটলারের পরাজয়ের পর যখন জার্ম্মানীর সহিত কথাবার্ত্তা চালানো হইবে, তখন ফ্যাশি প্রভাব মুক্ত জার্ম্মানীর সহিত তাহা হইবে। তাহার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই হিটলার এবং হিটলারবাদীরা অপসারিত হইবেন। ফ্যাশিতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে।

গত যুদ্ধেও এই প্রকারের অবস্থা হইয়াছিল। কাইজারের সহিত মিত্র পক্ষ মিটমাট অথবা সন্ধির কথাবার্ত্তা চালান নাই। তাহা চালাইবার জন্য অন্যদল এবং লোক খাড়া করা হইয়াছিল। এবারও নিশ্চয়ই তাহাই হইবে। কিন্তু এবার কাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা চলিবে। কোন্ দল নূতন জার্ম্মানীর ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবে। নূতন কোনও ধনী দলের আসা কি সম্ভব ?

আমাদের মনে রাখিতে হইবে ফ্যাশিবাদ হইতেছে ধনতন্ত্রের সংহত রূপ। এই সংহত কাঠামোর বাহিরে কেহ থাকিতে পারে নাই। কেহ যদি সর্ব্বশক্তি একত্রিত করিয়া লড়াই করে এবং সেই লড়াইয়ে তাহার পরাজয় ঘটে, তাহা হইলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। গত যুদ্ধের সময় জার্ম্মান ধনতন্ত্র এইভাবে সংহত হইয়া ওঠে নাই। শাসকগোষ্ঠির বাহিরেও ধনিকদল ছিল। ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহারা ক্ষীণ চেষ্টা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু, ফ্যাশিবাদ হইতেছে ধনিকশ্রেণীর শ্রেণী কর্তৃত্ব। একদিকে যেমন বিপ্লব ঠেকাইবার জন্য শ্রমিকদের কঠোরভাবে দমন করা হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনই ছোট মাঝারি ধনীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। ভিন্ন মতাবলম্বীরা বিতাড়িত হইয়াছে। জবরদস্ত শাসক গোষ্ঠির বাহিরে ধনিকদের আর কোন দল নাই। এই অবস্থায় ফ্যাশিবাদ নির্ম্মূল হইলে, অন্য কোন প্রকার ধনবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। এই যুদ্ধে ধনতন্ত্রের সকল শক্তি

নিঃশেষিত হইয়া যাইবে এবং দাঁড়াইবার মত শক্তির বিন্দুমাত্র অবশেষ থাকিবে না।

এখন ধনতন্ত্র যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে, ধনিকগোষ্ঠীর ধনিক হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহা হইলে অবস্থাটা কি দাঁড়াইবে? জার্ম্মানীর ধনিকগোষ্ঠীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান জাতি নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইবে না। জার্ম্মাণ জনসাধারণ তখনও বাঁচিয়া থাকিবে এবং জাতির মধ্যে ধনিক শ্রেণীর বাহিরে যাহারা থাকিবে নূতন জার্ম্মানীর ভার গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে আগাইয়া আসিতে হইবে।

কিন্তু, জনসাধারণকে কোনো একটি দলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কাহারা এই দল গঠন করিবে, কাহারা জনগণকে একত্র করিবার শক্তি রাখে? জনসাধারণকে যে দল একত্র করিতে পারে ও করিতেছে, সে হইতেছে জনগণের নিজস্বদল অর্থাৎ সাম্যবাদী দল। জার্ম্মানীতে ফ্যাশিজমের ধ্বংসের পর শ্রমিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতীত, দ্বিতীয় কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। জার্ম্মানীতে অন্য কোন প্রকার রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যদি সম্ভবনা হয় তবে, সোভিয়েটতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লওয়া ব্যতীত উপায় কি? যদি বৃটেন ও আমেরিকা ইহার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে এই সময়ে এবং এই ব্যাপারে সোভিয়েট রুশিয়া যে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করিবে না সে কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ব্রিটীশ জনগণও ইহাতে সম্মতি দিবে না।

ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তিতে বৃটেনের পক্ষে আজ এই পথ বন্ধ হইল।

ফ্যাশিষ্ট বাহিনীর পরাজয়ের সময়ে নিপীড়িত জনগণ যদি নিষ্ক্রিয় ও শান্ত হইয়া বসিয়া না থাকে তবে সেখানে ধনতন্ত্রের আর বাঁচিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইওরোপের ধনিক দল ফ্যাশিষ্টপন্থী ও ব্রিটীশপন্থীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ফ্যাশিষ্ট প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটীশপন্থীরা তিরোহিত হইয়াছেন। দেশের লোকের মধ্যে এখন দুইটী মাত্র দল অবশিষ্ট আছে। অত্যাচারী ফ্যাশিষ্ট শাসক দল এবং উৎপীড়িত ও ক্ষুব্ধ জনগণ। ফ্যাশিষ্ট দলের অপসারণ যুদ্ধ শেষে নিশ্চয়ই ঘটিবে সুতরাং এই অবস্থায় এই সব দেশে জনগণের দল, কম্যুনিষ্ট দলই নূতন ইওরোপ গঠনের দায়িত্ব লইবার সুযোগ পাইবে।

ফ্যাশিষ্টদের পরাজয়ের পর জার্ম্মানীতে ও অধিকৃত ইওরোপে ধনবাদ যে বাঁচিতে পারে না, একথাটাকে আরও এক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখা যায়। ফ্যাশিজমের জন্ম বৃত্তান্ত এখানে স্মরণ করিতে হইবে। ধনতন্ত্র যতক্ষণ সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারে ততক্ষণ তাহার শ্রেণী কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না। ততক্ষণ শোষিত শ্রেণীর সহিত স্বার্থের বিরোধকে সে ঢাকিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু, যখন বাজারে মাল বিকায় না, পুঁজি খাটাইবার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া যায়, বাজার না থাকায় কম মুনাফায় মাল বিক্রয় করিতে হয়, বেশী দরে কাঁচামাল

কিনিতে হয় তখন বেকার সমস্যা বহু ব্যাপক হইয়া উঠে, শ্রমিক অসন্তোষকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না এবং বিপ্লব দ্বারে করাঘাত করিতে থাকে। এই সময় আসন্ন পতনের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য শ্রেণী কর্ত্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন হয় এবং কঠোর সামরিক শাসনের জোরে বিপ্লবকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয়। সমর প্রস্তুতির আয়োজন ও উত্তেজনার মধ্যে সমস্যাকে সাময়িকভাবে চাপা দিয়া শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধের মধ্যে সমাধান খুঁজিতে হয়। ইহা ব্যতীত তাহার আর বাঁচিবার উপায় থাকে না। যুদ্ধে যদি জয়লাভ করিয়া বাজার প্রসারিত করিতে পারে তাহা হইলে হয়ত আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয়। আর যদি যুদ্ধে পরাজয় ঘটে তাহা হইলে নিঃশেষে তাহার আয়ু ফুরাইয়া যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বেই জার্ম্মান ধনিক-তন্ত্রের এই সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং তাহাদের আত্মরক্ষার পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বেই যাহার বাঁচিবার উপায় ছিল না, যুদ্ধের আঘাত সহিয়া সে কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে।

জার্ম্মাণ ধনিকতন্ত্রের বাঁচিয়া থাকিবার উপায় যদি না থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধের পরে সেখানে অন্য ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া ব্যতীত আর কি সম্ভাবনা আছে এবং ধনিক-তন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িলে সেখানে সোভিয়েট ব্যতীত আর কোন্ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে।

ফ্যাশিবাদের ধ্বংসের পরে সাম্রাজ্যবাদের যে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, তাহার সবচেয়ে বড় কারণটির কথা এখনও

বলা হয় নাই। কি উপায়ে ফ্যাশিবাদের পরাভব ঘটিতে পারে, কেন ফ্যাশিষ্ট সমরযন্ত্রের কাছে বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী দেশগুলির সামরিক শক্তি এত শীঘ্র পরাভব স্বীকার করিল? ইহার প্রধান কারণ ফ্যাশিষ্ট সমরযন্ত্রের পশ্চাতে ফ্যাশিষ্ট দেশগুলির সমগ্র শক্তি নিয়োজিত আছে। এই সব দেশের প্রত্যেক মানুষ যুদ্ধযন্ত্রের অংশ, প্রত্যেকটি মানুষের শিক্ষা দীক্ষা যুদ্ধে লাগিবার উপযোগী করিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। উৎপাদন শক্তিকেও পূর্ণভাবে যুদ্ধে লাগান হইয়াছে, কাজেই এই সামগ্রিক যুদ্ধে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর দেশগুলি টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই।

এই সামগ্রিক অভিযান সর্ব্বপ্রথম সোভিয়েট ভূমিতে প্রতিহত হইয়াছে, কেননা সোভিয়েটও তাহার দেশের সমগ্র জনশক্তিকে যুদ্ধে লাগাইতে পারিয়াছে। কিন্তু হিটলারের সুবিধার কথা মনে রাখিতে হইবে। সে সমগ্র ইওরোপে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ইওরোপের বিপুল উৎপাদন ক্ষমতাকে এবং তাহার সমগ্র জনবলকে জোর করিয়া সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেছে। প্রাচ্যে সোভিয়েটের পশ্চাদ্দেশে অন্যতম ফ্যাশিষ্ট সহযোগী জাপান এশিয়ার সমৃদ্ধতম অঞ্চলগুলি হস্তগত করিয়া দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে।

এই অবস্থায় সোভিয়েটের জয় এবং ফ্যাশিবাদের পরাভব কি উপায়ে ঘটিবে? সোভিয়েটের লালফৌজই অবশ্য এই যুদ্ধের প্রধান বাহিনী এবং তাহারই প্রতিরোধ ও আক্রমণের শক্তির উপর যুদ্ধের জয় নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু লালফৌজের শক্তির উৎস কোথায়? নিঃসন্দেহ সোভিয়েটের জনগণের মধ্যে। যদিও সোভিয়েটের জনগণ এবং লালফৌজ এইজন্যই অপরাজেয় যে, পৃথিবীর জনগণের সহিত ফ্যাশিবিরোধী যুদ্ধে সে আজ সম্মিলিত। এই সম্মিলিত জনবাহিনী তাহার নেতৃত্বে তাহার পশ্চাতে থাকিয়া লড়াই চালাইতেছে বলিয়া সোভিয়েটের ভবিষ্যৎ জয় সুনিশ্চিত। দেশে দেশে কোটী কোটী হস্তে এই সম্মিলিত বাহিনী ফ্যাশিবাদকে আঘাত করিতেছে সত্য, কিন্তু আজও ইহা শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে নাই।

যখন, এই গণবাহিনীর শক্তি আরও বর্দ্ধিত হইবে তাঁহাদের আদর্শ স্পষ্টতর রূপ গ্রহণ করিবে এবং সংহতি আরও বাড়িবে তখনই মাত্র ফ্যাশিবাদের সম্পূর্ণ পরাভব সম্ভব হইবে।

ফ্যাশিবাদ প্রতিদেশেই বিস্তৃত জাল বিস্তার করিয়াছে। প্রতি দেশ হইতে তাহা নির্ম্মূল করিতে পারিলে তবেই ফ্যাশিবাদ সম্পূর্ণ নির্ম্মূল হইবে। ফ্যাশিবাদকে নির্ম্মূল করিবার জন্য প্রতিদেশেই জনগণকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে ও সংগ্রাম করিতে হইবে। যে জনগণ ফ্যাশিবিরোধী সংগ্রামে সংঘবদ্ধ ও শক্তিমান হইবে, যাহাদের শক্তির কাছে ফ্যাশিবাদ পরাজিত হইবে সেই জাগ্রত সচেতন ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি সাম্রাজ্যবাদকেও প্রতিরুদ্ধ করিবে।

ইটালী ও জাপানের কথা পৃথকভাবে আর আলোচনা করা হইল না। যে হিটলারী জার্ম্মানী ফ্যাশিষ্ট দলের সামরিক ও

রাজনীতিক নেতা—সে পরাজিত হইলে সমগ্র ফ্যাশিষ্টবাহিনীই পরাজিত হইবে। ইটালী বা জাপানের একক বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা ও আশা থাকিবে না। গণতন্ত্রের পক্ষে যদি লালফৌজের পরাভব ঘটে তাহা হইলে যেমন আর এ পক্ষের দাঁড়াইবার আশা থাকে না অপর পক্ষেও তেমনি জার্ম্মানীর পরাজয়ে সকলেরই পরাজয় ঘটে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে, জার্ম্মানী ও অধিকৃত ইওরোপের অবস্থা সম্পর্কে যাহা বলা হইল তাহা হইতেছে, অবস্থার পরিচয় মাত্র—ঘটনাস্রোতের দিঙনির্ণয়। কিন্তু, এই অনুকূল অবস্থাকে লক্ষ্যাভিমুখে লইয়া যাইবার দায়িত্ব জনগণ এবং প্রতিদেশের সাম্যবাদীগণের উপর রহিয়াছে। যদি তাঁহারা কোথাও নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাহা হইলে ফ্যাশিবাদের পরাভবের পরও জনগণের জয়লাভ না ঘটিতে পারে। প্রতি দেশের জনগণের চেষ্টার উপরই এই সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। সমগ্র বিশ্বের গণশক্তির সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতীত বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের অবসান হইবে না।

আজ যদি ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনগণ নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাহা হইলে জনগণের যে বর্দ্ধমান শক্তির কাছে সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিদিন আত্মসমর্পণ করিতে হইতেছে, শেষ মুহূর্ত্তে তাহার পরাজয় ঘটিতে পারে। ইঙ্গ-আমেরিকার বিরাট সামরিক প্রস্তুতির কর্ত্তৃত্ব জনগণের হাতে না আসিতে পারে এবং সোভিয়েটকে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে হইতে পারে।

যদি অধিকৃত ইওরোপ এবং জার্ম্মানীর জনগণ তাঁহাদের দায়িত্ব পালন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও বিপদ ঘটিতে পারে। যদিও এসকল দেশে ধনবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার মত অবস্থা নাই, তবুও বাহিরের সামরিক শক্তির আশ্রয়ে ফ্যাশি-বাদের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব নহে। মিত্র পক্ষের জয়লাভের পরও বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিশ্বসভ্যতার অবসান ঘটিতে পারে। আর যদি দেশে দেশে জনগণ নিরলসভাবে এই ঐতিহাসিক দায়িত্বকে বহন করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে যে অভূতপূর্ব্ব সুযোগ বিপুল দুঃখের মূর্ত্তি লইয়া তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, ইহা তাঁহাদের এবং জগতের শেষ মুক্তি সংগ্রামে পরিণত হইবে। তাহাতে সন্দেহ বা দ্বিধা করিবার কারণ নাই।

এই সব আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, এবারকার শান্তি বৈঠকে পৃথিবীর ভাগ বাটোয়ারার প্রস্তাব উঠিতে পারিবে না। সোভিয়েটের উপস্থিতির দ্বারা তাহা নিবারিত হইবে। যুদ্ধের শেষ অঙ্কে যে পরিণতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহার দ্বারা তাহা নিবারিত হইবে। ইওরোপ যে অপরিহার্য্য অবস্থার মধ্যে পড়িবে তাহার দ্বারাও তাহা নিবারিত হইবে। উপনিবেশিক দেশ সমূহে ফ্যাশিষ্ট প্রতিরোধের মধ্য দিয়া যে বিপুল গণশক্তির অভ্যুদয় হইতেছে তাহাও পৃথিবীর ভাগবাটোয়ারাকে অসম্ভব করিয়া দিবে। সুতরাং যুদ্ধে সোভিয়েটের জয়ের পরও যাহারা সাম্রাজ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশঙ্কা করিতেছেন তাহাদের সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক।

ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি

সম্প্রতি সম্পাদিত ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির কেহ কেহ এরূপ অপব্যাখ্যা করিতেছেন যে, সোভিয়েট, যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্রিটীশের সহিত সন্ধি করিল। কাজেই, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের আর আশঙ্কার কারণ থাকিল না।

যুদ্ধ সম্পর্কে এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে একথা বুঝা যাইবে যে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের সূচনাই এই চুক্তিতে সরকারীভাবে স্বীকৃত হইল। এই চুক্তির প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে উভয় পক্ষের গভীরতর সামরিক সহযোগিতা ও ইওরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণের সৃষ্টি। এই দুইটিই হইতেছে বৃটেনের ও পৃথিবীর জনগণের অবিশ্রান্ত দাবী। ব্রিটীশ সরকারকে যে শেষ পর্য্যন্ত এই দাবী মানিয়া লইতে হইয়াছে ইহা জনগণের সম্মিলিত শক্তির কাছে সাম্রাজ্যবাদের আত্ম-সমর্পণের কথাই প্রমাণ করিতেছে।

জনগণ চাহে, সোভিয়েট রুশিয়াকে তাহারা চূর্ণ হইতে দিবে না। তাহাকে যথাসম্ভব ক্ষয় ও ক্ষতির হাত হইতে বাঁচাইবে। জনগণ আরও চাহে যে, যুদ্ধের সময় নিষ্ক্রিয় থাকিয়া যুদ্ধ হইতে হাত গুটাইয়া, জনগণের সংস্পর্শ হইতে সাম্রাজ্যিক সরকারকে তাহারা কিছুতেই দূরে থাকিতে দিবে না। প্রাচ্য

সাম্রাজ্যের উপর ফ্যাশিষ্ট দস্যুদের হানা। জনগণের এই চাপকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে।

যুদ্ধের সঙ্কটের সময় আভ্যন্তরীণ ফ্যাশি-চক্রান্ত ব্রিটীশ সরকারকে প্রভাবিত করিয়া যাহাতে ফ্যাশিবাদের সহিত মিটমাটের জন্য প্ররোচনা দান করিতে না পারে, ব্রিটীশ জনগণের কাছে, পৃথিবীর জনগণের কাছে এই প্রতিশ্রুতি ব্রিটীশ সরকারকে এই চুক্তির মধ্য দিয়া দিতে হইল।

কিন্তু, আলোচ্য চুক্তিতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ আরও শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছে। যুদ্ধের পর ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করিবে না। রাজ্য বাড়াইবে না। ইওরোপের জনগণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে বাধা দিবার ক্ষমতা যে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের থাকিবে না সে কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই চুক্তিতে তাহারই সরকারী প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। সোভিয়েটে রুশিয়া কাহারও রাষ্ট্রিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। কোন দেশের গণ-অভ্যুত্থানে যাহাতে বাহিরের হস্তক্ষেপ না হয়, তাহাই হইতেছে সোভিয়েটের লক্ষ্য। এই নবযুগ প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েটের সহিত সহযোগিতা করিবার প্রতিশ্রুতি বর্ত্তমান ব্রিটীশ সরকারকে বাধ্য হইয়া দিতে হইয়াছে।

একটা প্রশ্ন উঠিবে। অধিকৃত দেশ সমূহের লণ্ডনস্থ গবর্ণমেণ্টগুলির সহিত সোভিয়েট সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। কাজেই, উভয়েরই এই গবর্ণমেণ্টকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

কিন্তু, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে এই সব সরকারের শক্তির উৎস হইতেছেন তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের বিপ্লবী জনসাধারণ। বর্ত্তমানে সোভিয়েটের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা জাতীয় জীবনে এই জনগণের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছেন। ইঙ্গ সোভিয়েট সন্ধি যদি না হইত তাহা হইলে, যুদ্ধান্তে এই সকল গবর্ণমেণ্ট, ব্রিটীশ ও সোভিয়েটের নিকট এই দাবী আইনত করিতে পারিতেন যে, তাঁহাদিগকেই তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের আইনত প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হোক, (যাহা পূর্ব্বেই হইয়াছে) এবং পূর্ব্বের ন্যায় জনগণের মাথার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে তাঁহাদিগকে সামরিক সাহায্য দেওয়া হোক।

যদিও সোভিয়েটের উপস্থিতির জন্য তাহা সম্ভব হইত না এবং ইংলণ্ডের জনগণ, অন্যান্য দেশের জনগণের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে রাজী হইত না, তবুও একটা আইনের প্রশ্ন থাকিয়া যাইত। কিন্তু, আলোচ্য সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে সোভিয়েট এবং বৃটেন এই সকল দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ফলে যুদ্ধের সময় যেরূপ হইয়াছে, যুদ্ধের পরেও এই সকল সরকারকে জনগণের নেতৃত্ব মানিয়া লইতে হইবে, অন্যথা জনগণের প্রতিনিধিরাই গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন। জনগণের যে বৈপ্লবিক শক্তি ফ্যাশিষ্ট শৃঙ্খলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে, তাহা স্বদেশী অথবা বিদেশী ধনিক রাষ্ট্রের শোষণ-শৃঙ্খলকে মাথা পাতিয়া লইবে না।

এই সকল বিপ্লবজাত নব গঠিত রাষ্ট্র, আর্থিক বিধান ও সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিবার জন্য দেশের সর্ব্বস্বীকৃত নীতি অনুযায়ী সোভিয়েটের সহযোগিতা চাহিতে ও পাইতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট ও আমেরিকার মধ্যে চুক্তি এবং মেক্সিকো সরকারের রুশিয়া মিশনকে স্বদেশে আহ্বানও বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ব্রিটীশ ও আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগিতা যুদ্ধ দ্রুত জয়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক। জনগণ যুদ্ধ দ্রুতই জয় করিতে চাহে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি উভয় সঙ্কটে পড়িয়া ঢিলাতালে চলিয়াছিলেন। কিন্তু জনগণের কাছে তাঁহাদের আত্মসমর্পণ না করিয়া উপায় নাই।

কিন্তু বৃটেনের জনসাধারণকেও তাঁহাদের দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। জনগণের যে বর্দ্ধমান শক্তির প্রমাণ তাঁহারা পাইতেছেন, তাহাকে প্রতিদিন প্রতি ক্ষেত্র হইতে পুষ্ট করিয়া দ্রুত লক্ষ্যপথে লইয়া যাইতে পারিলেই তবে সাফল্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। চুক্তি যাহাই কিছু হোক না কেন, প্রতিশ্রুতি যাহাই দেওয়া হোক না কেন, তাহার পশ্চাতে যদি শক্তি না থাকে তাহা হইলে তাহাকে মর্য্যাদা কেহই দেয় না।

ব্রিটীশ শাসনযন্ত্রে যেমন ব্রিটীশ জনগণের শক্তি প্রতিদিনই অনুভূত হইতেছে, তেমনই ব্রিটীশ জনশক্তির দুর্ব্বলতার কথাও ব্রিটীশ গণনেতাদের মনে রাখিতে হইবে। সোভিয়েট রুশিয়া

চরম সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতেছে কিন্তু, আজও পশ্চিম ইওরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণের সৃষ্টি হয় নাই। চীনের শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম, ভারতবর্ষ পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতে বিপন্ন, তবুও ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বাধামুক্ত করিবার জন্য ভারতের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করিবার দাবী গৃহীত হয় নাই।

ভারতের মুক্তি বিশ্বমুক্তির অন্তর্ভুক্ত

যুদ্ধ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাতে এই সম্পর্কে আমাদের ভারতবাসীদের কর্ত্তব্য যে কি, আশা করা যায় তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। আমরা ভারতবাসীরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে অনেক দিন আবদ্ধ আছি। উপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থায় আমরা নিঃস্ব ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। শোষণ ও অত্যাচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত তিক্ততায় আমাদের মন পূর্ণ রহিয়াছে। আমরা এই শোষণ ও নিষ্পেষণ হইতে মুক্তি চাই, জগতে স্বাধীন মানুষের সুখ-সৌভাগ্য ও অধিকার লইয়া বাঁচিতে চাই। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই তাই, আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টার মূল ও প্রধান কথা।

আমরা ব্রিটীশ সাম্রাজ্য-তন্ত্রের অধীন। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত আমাদের মুক্তি প্রচেষ্টার দীর্ঘদিন ধরিয়া সংঘর্ষ চলিয়াছে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা, সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রিটীশ বিদ্বেষের রূপ নিয়াছে। আমরা মুক্তি চাই, কিন্তু, কাহার হাত হইতে মুক্তি চাই? নিশ্চয়ই ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে মুক্তি চাই; কাজেই আমাদের স্বাধীনতার জন্যই ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের অপসারণের যে প্রয়োজন, এই কথাটা আমাদের মনে এইভাবে রূপ নিয়াছে যে, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ এখান হইতে অপসৃত হইলেই আমাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত।

দীর্ঘদিনের অবিচার ও অত্যাচারের যে ক্ষোভ তাহার জন্য আমাদের অনেকে মনে করিতেছেন, পরে যাহা হয় হোক, প্রথমে তো ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যাক।

কিন্তু, আসলে কথাটিকে আমাদের আরও নিরাসক্ত ভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। স্বাধীনতা এবং শোষণ হইতে মুক্তি নিঃসন্দেহে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাম্য এবং তাহার জন্য আমরা প্রত্যক্ষভাবে যাহাদের অধীন আছি, তাহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। ইহার জন্য আমাদের দেখিতে হইবে এবং খুব সাবধান ও সতর্ক হইয়াই দেখিতে হইবে যে, যে পথে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদকে সরাইতে চাহিতেছি, সেই পথ বাহিয়া আরও শক্তিশালী, আরও নির্ম্মম ও কঠোর প্রভু আসিয়া হাজির না হয়। ভারতবর্ষের শেষ স্বাধীনতা কি ভাবে আসিতে পারে সে কথা প্রথম বিচার করিয়া দেখা যাক। অন্য পথের বিপদ ও অযৌক্তিকতার কথা পরে আলোচনা করা যাইবে।

আমাদের প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, কোন দেশেরই রাজনীতিক ভাগ্য বিশ্বঘটনা স্রোতের বাহিরে নাই। বিচ্ছিন্নভাবে কোন দেশের মুক্তি প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। বিশ্ব-পরিস্থিতির চাপে তাহা স্থিরীকৃত হইবে।

যদি এই যুদ্ধে ফ্যাশিবাদ জয়ী হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষকে সে রেহাই দিবে না। বিশ্ব-গ্রাসই হইতেছে তাহার লক্ষ্য এবং ভারতবর্ষের উপর ফ্যাশিষ্ট আক্রমণ আজ প্রত্যাসন্ন। যদি ভারতবর্ষ

ফ্যাশিষ্টদের দ্বারা অধিকৃত হয় তাহা হইলে আমাদের এত দিনের জাতীয় মুক্তি-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। জাতীয় মুক্তি-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া যে শক্তি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন ও চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইবে। বহু দিনে, বহু সহীদের বহু আত্মত্যাগে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, বর্ব্বরতার নগ্ন অভিযানে তাহা বিলুপ্ত হইবে। নূতন করিয়া গলায় দাসত্বের ফাঁস জড়াইবে, আবার কতদিন পরে নূতন করিয়া গোড়া হইতে মুক্তি প্রচেষ্টা আরম্ভ করিতে হইবে। অনেক দিন ধরিয়া যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির গোড়া পত্তন হইয়াছে তাহা নষ্ট হইবে ; সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকেরা, দেশপ্রেমিকেরা, জাতীর কল্যাণকামীরা নিহত, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইবেন। বিশ্বাসঘাতক ও হীনচরিত্রের লোকেরাই সমাজে প্রাধান্য পাইবে, বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারের বন্যায় সমাজের ভিত ধ্বসিয়া যাইবে। কাজেই আমরা যদি ইংরেজের উপর রাগ করিয়া ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে না দাঁড়াই, তাহা হইলে ইংরেজের অপেক্ষা আমরা নিজেরাই অনেক বেশী জব্দ হইয়া যাইব।

আমরা যদি ইংরেজের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বর্ত্তমানে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে সেই ভুল—মুক্তি সংগ্রামের ফলে আমাদের মুক্তি আসিবে না। আক্রমণকারী শত্রুর পক্ষে ব্রিটীশ প্রতিরোধকে হটাইয়া দেওয়া অনেক সহজ হইবে এবং তাহার ফলে ফ্যাশিষ্ট দাসত্বের পথ আমাদের কাছে উন্মুক্ত হইবে। ইংরেজ আমাদিগকে কিছু

দেয় নাই, এই অভিমানে যদি আমরা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকি, তাহা হইলেও শত্রুকে দেশ অধিকারে সাহায্য করা হইবে। আমরা এতদিন ইংরেজের অধীন আছি বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি যে আমাদের প্রথম সংগ্রাম চালাইতে হইবে, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এবং ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ অপসারিত হইলে, তখন অন্যদের সঙ্গে প্রয়োজন মত লড়িতে হইবে। তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে ক্ষয়িষ্ণু ব্রিটীশ-সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে আমরা মুক্ত হইলাম বটে, কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দান্ত ফ্যাশিবাদের কবলে পতিত হইলাম। এই জন্য আমাদের মুক্তি প্রচেষ্টাকে যদি শুধু দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত করা হয়, তাহা হইলে নিদারুণ ভুল করা হইবে এবং সেই ভুলকে ইতিহাস কখনই ক্ষমা করিবে না।

অথচ, আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে বৃটেনের জয় হইলেও, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের আয়ু ফুরাইয়াছে, উদ্ধত ফ্যাশিবাদের হাতে বিশ্ব ও ভারতবর্ষের মুক্তি বিপন্ন। ফ্যাশিষ্ট অভিযানকে প্রাণপণে বাধা দেওয়াই আজ বিশ্ব ও ভারতবর্ষের শেষ মুক্তি-সংগ্রাম।

অন্যপক্ষে আমরা যদি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব সোভিয়েটের নেতৃত্বে ফ্যাশিষ্ট অভিযানের বিরুদ্ধে বিশ্ব-মানবের যে মুক্তি সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, ভারতবর্ষের সহিত তাহার যোগাযোগ—আপাতদৃষ্টিতে ঘনিষ্ট বলিয়া

বোধ না হইলেও, ভারতবর্ষের মুক্তি এই সংগ্রামের সাফল্যের উপরই নির্ভর করিতেছে। অন্য যে-কোন প্রকার খণ্ড প্রচেষ্টা তাহার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে।

ব্রিটীশ আজ এই যুদ্ধে সহযোগী বলিয়া এবং ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ আজও আমাদের উপর চাপিয়া আছে বলিয়া এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। তাহাদের ধারণা সোভিয়েটের জয় হইলেও ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ টিঁকিয়া থাকিবে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাহাতে কিছুমাত্র নিকটবর্ত্তী হইবে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাহারা বলেন যে কই,—যুদ্ধের এত বড় চাপে এবং এত বড় দুর্দ্দিনেও সাম্রাজ্যবাদের কঠিন মুষ্টি কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই।

কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদ কখনই স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে না। পূর্ব্ব আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে ইওরোপের পশ্চিম প্রান্ত হইতে এশিয়ার পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত কোথাও ধন-তন্ত্রের টিঁকিয়া থাকিবার আশা নাই। স্পেন হইতে চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের কোটী কোটী অধিবাসী, কোটী কোটী হস্তে আঘাত করিয়া প্রতি নিয়ত ইহার ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতেছে। বৃটেনে, খাস ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মনোভাবে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। ফ্যাশিবাদের পতনের পর যদি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষেই বা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে শঙ্কিত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে।

অনেকে বলেন, শাসক-শ্রেণীর কথা দূরে থাকুক, ইংলণ্ডের জনসাধারণের মন যদি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার পরিচয় মিলিতেছে কই। ইহার প্রথম উত্তর এই যে, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশের এই আভ্যন্তরীণ সামাজিক পরিবর্ত্তন ভারতবর্ষের ব্যাপারে প্রতিফলিত হইবার সময় এখনও আসে নাই। পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষ অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকিলেও ভারতবর্ষের রাজনীতিক গুরুত্ব সাধারণ লোকের কাছে বেশী নাই। কাজেই ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া পৃথিবীর কোন বৃহৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না।

আজ সকলেরই দৃষ্টি সোভিয়েটের দিকে। সোভিয়েটের প্রতিরোধ ক্ষমতা, শত্রুকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহার নির্ম্মম সংকল্প, তাহার পোড়ামাটীর নীতি অনুসরণ, সমগ্র জনশক্তির অদ্ভুত ঐক্য, আজ মুক্তিকামী বিশ্বকে আদর্শ, প্রেরণা ও শিক্ষা যোগাইতেছে। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রত্যেকটি নরনারী কেন সোভিয়েটের পিছনে সর্ব্বস্বপণ করিয়া দাঁড়াইতেছে, এই কথাই আজ সারা পৃথিবীকে সজোরে নাড়া দিতেছে। সোভিয়েট রুশিয়াকে কেন্দ্র করিয়াই এই ভাবে প্রগতির শক্তি কাজ করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রতি বৃটেন অথবা বিশ্বের ঔৎসুক্যহীনতা দেখিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ মাপা যাইবে না।

তবুও ভারতবর্ষের প্রতি যে ব্রিটীশ জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাও আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকিবার কথা

নহে। ভারতবর্ষকে মুক্তি দাও, যুদ্ধে ভারতবর্ষের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ কর প্রভৃতি ধ্বনির অন্তরালে বৃটেনে উপনিবেশিক মুক্তির আন্দোলন চলিতেছে। ইংল্যাণ্ডপ্রবাসী ভারতীয়েরা এই আন্দোলনকে অগ্রসর করিয়া চলিয়াছেন। ক্রমেই অধিকসংখ্যক শ্রমিক সদস্য (পার্লামেণ্টে) এবং অন্যান্য দলের লোকও এই আন্দোলনে যোগদান করিতেছে, শ্রমিকদলের কার্য্যকরী পরিষদ গভর্ণমেণ্টের অভ্যন্তরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে পরিবর্ত্তন আনিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

উপনিবেশসমূহে সাম্রাজ্যিক শক্তির বিস্ময়কর দুর্ব্বলতা প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ আক্রমণ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শোচনীয় ভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত ব্রিটীশ এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা জাপ-ফ্যাশিষ্টদের প্রতিরোধ করিবার জন্য একমাত্র তোষণ নীতিকে আশ্রয় করিয়াই বসিয়াছিলেন। চীন ও সোভিয়েট রুশিয়ার দিকে জাপ-ফ্যাশিষ্টদের লেলাইয়া দিয়া তাঁহারা এই সমস্যাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। কাজেই যুদ্ধের জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হন নাই। তাঁহাদের প্রস্তুতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে।

তাঁহারা ভারতবর্ষ প্রভৃতি উপনিবেশের মুক্তি প্রচেষ্টাকে দাবাইয়া রাখিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইওরোপে জার্ম্মান-ফ্যাশিষ্টদের রুশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োগের চেষ্টা যেমন বিফল হইয়া যায়, জাপান সম্পর্কেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

হিটলার সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণ করায় ইওরোপের শাসক-শ্রেণীর মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে আক্রমণ আরম্ভ করায়, সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং শাসকশ্রেণীর ঐক্যসম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় কোন রাজনীতিক দলই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইত না, আমেরীর নীতির দ্বারাই সাম্রাজ্যিক নীতি নির্দ্ধারিত হইত। কিন্তু, আজ রক্ষণশীল দলের মুখপত্র "টাইম্‌স্" পত্রিকা হইতে শ্রমিক দলের মুখপত্র "ডেলী হেরাল্ড" পর্য্যন্ত যুদ্ধে ভারতবর্ষের সহযোগিতা পাইবার মত কিছু করিবার জন্য চীৎকার করিতেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে কোন রাজনীতিক দলই যুদ্ধের সহযোগিতা করেন নাই। জাতীয় ভারত সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের বাহিরে ছিল। যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে জোর করিয়া ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইতে হইয়াছিল। এবার যুদ্ধের সময় যেরূপ হইয়াছিল জনসাধারণ হইতে সরকারের বিচ্ছিন্নতা আর কোন সময় সেরূপ স্পষ্ট হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু জাপান পূর্ব্ব-সাম্রাজ্য আক্রমণ করায় শাসকবর্গ এক উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। হয়, আজ উপনিবেশগুলিকে মুক্ত করিয়া দিয়া এখানকার জনগণের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, না হয় যুদ্ধে জাপানীদের কাছে হারিতে হইবে। প্রথম দফায় উপনিবেশগুলি আর উপনিবেশ থাকে না, আর দ্বিতীয় দফায় উপনিবেশগুলি জাপানের হাতে ছাড়িয়া দিতে হয়।

ইংল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণী পূর্ব্বেই দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিলেন, ভারতশাসননীতি সম্বন্ধে আরও মতভেদ দেখা দিয়াছে। ভারতীয় সিভিলিয়ান ও জঙ্গীতন্ত্র কোন পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা ভারতীয় ধনিক নেতৃত্বের উপর নির্ভর করিতেছেন এবং দমন-নীতির সাহায্যে কোন রকমে টি"কিয়া থাকিবার আশা করিতেছেন। বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের মধ্যে ইঁহাদিগকে বিঘ্ন-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইঁহারা বরং জাপানীদের সহিত ভাগাভাগি করিতে রাজী হইবেন তবুও তাহাদের পূর্ব্বতন নীতি পরিবর্ত্তনে রাজী হইবেন না। ইঁহারা হইতেছেন পাকা বড় সাহেব।

শাসকবর্গের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উদারনীতিক তাঁহারা ফাশিবাদকে ভয়ের চক্ষে দেখিতেছেন এবং ফ্যাশিষ্ট আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষে যে গভীর বিপদ দেখা দিতে পারে তাহা বুঝিতেছেন। জনগণের সহায়তা ব্যতীত ভারতবর্ষ রক্ষা করা যাইবে না। প্রধান প্রধান রাজনীতিক দলগুলির সহায়তা ব্যতীত সমর প্রচেষ্টা পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা যাইবে না। ইঁহারা ভারতের বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বের সহিত মিটমাটের পক্ষপাতী। কংগ্রেস ও লীগের সহিত একটা বুঝাপড়া করিয়া লইবার জন্য ইঁহারা চাপ দিতেছেন।

পুরাতন শাসকবর্গ ইতিমধ্যে বিপদে পড়িয়াছেন। জন-সাধারণের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ জীয়াইয়া রাখিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিবার পূর্ব্বতন নীতি এখন আর

নিরাপদ নহে। কারণ, শত্রুরা যখন দ্বারে করাঘাত করিতেছে, তখন আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার আঘাত সর্ব্বশেষে নিজেদের গায়ে লাগিবার আশঙ্কা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভারতবর্ষে দমনীতি চালাইবারই বা অবসর কোথায়। রাজনীতিক দলগুলির সকলেই একবাক্যে জাপবিরোধী নীতি সমর্থন করিতেছেন। কাজেই পরিবর্ত্তন বিরোধী ঝুনা শাসকদলও বিব্রত হইয়া পড়িতেছেন।

অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের উপর ইহার কি প্রভাব হইয়াছে? প্রশান্ত মহাসাগরের ঘটনাবলীতে জাপানীদের অতি দ্রুত অগ্রগমন, ইওরোপে হিটলারের সাফল্যের ন্যায়ই বিস্ময়কর হইয়াছে। ভারতবর্ষেরও অন্যান্য উপনিবেশের শাসনব্যবস্থা ও শাসক-বর্গের স্বরূপ ও আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা যেভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, আর কিছুতে তাহা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ! ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার জন-সাধারণের কাছে ইহা অপ্রত্যাশিত আঘাতের আকারে আসিয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন জনগণের সমাবেশ এবং জনগণের সহযোগীতা ব্যতীত এই যুদ্ধে জয়লাভ করা যাইবে না। অর্থাৎ একই সঙ্গে ইহা উপনিবেশ সমূহেরও মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হইবে। লণ্ডনে আমাদের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের সময় ব্রিটীশ কম্যুনিষ্টপার্টির নেতা কমরেড হ্যারিপলিট বলেন, যদি মিত্রপক্ষকে জয়লাভ করিতে হয় তাহা হইলে বৃটেনের ভারত শাসন-নীতি বদলাইতে হইবে। সাম্রাজ্যিক শক্তিবর্গের প্রতিশ্রুতিতে জনগণের আস্থাহীনতার সুযোগ জাপান পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতেছে।

যে মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিব তখনই সুদূরপ্রাচ্যে শক্তিশালী ফ্যাশিষ্টবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হইবে এবং শীঘ্রই ইহা জাপানের দুরাকাঙ্ক্ষার শেষ করিয়া দিবে। এখানে ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতার দাবী বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জনগণের শক্তি ভারতবর্ষে, বৃটেনে এবং বিশ্বের অন্য সর্ব্বত্র কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সাম্রাজ্যবাদ কি নিদারুণ সঙ্কটে পতিত হইয়াছে, তাহা আলোচিত হইল। আজ যদি আমরা সর্ব্বশক্তি দিয়া ফ্যাশিবাদকে আঘাত ও তাহার পরাজয়ের সাহায্য করি, তাহা হইলেই আমাদের দাসত্বের অবসান হইবে। ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই আমাদের মুক্তি যুদ্ধ।

এ সম্পর্কে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা নিশ্চল নিশ্চেষ্ট হইয়া যদি শুধু সাম্রাজ্যিক কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা চালাই তাহা হইলে এই সুবর্ণসুযোগ আমাদের নষ্ট হইবে। অন্য কেহ আমাদের স্বাধীনতা পুরস্কারস্বরূপ দিতে পারিবে না—তাহা আমাদের অর্জ্জন করিতে হইবে। বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের গণ-মুক্তির সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া আমাদের দুনিয়ার গণশক্তির সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই সাম্রাজ্যবাদকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিবে। যে বিপুল প্রতিরোধশক্তি গড়িয়া উঠিবে তাহা সাম্রাজ্যবাদকেও তিষ্ঠিতে দিবে না।

নিষ্ক্রিয়তা বাঁচিবার উপায় নহে

ফ্যাশিবাদের বিজয়ে যদি বিশ্বের জনগণের স্বাধীনতা বিপন্ন হয় এবং তাহা ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে অপরদিকে আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতায় এবং গণশক্তির জাগরণে যদি ব্রিটীশ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আর বাঁচিয়া থাকিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে নিঃসন্দেহ স্বাধীনতালাভের জন্য ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে।

কিন্তু, প্রশ্ন উঠিবে যে ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের যদি সংগ্রাম করাই স্থির হয়, তাহা হইলে সঙ্কটে পতিত ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদকে অসহযোগিতার চাপ দেওয়া ভাল হইবে না কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিবে ফ্যাশিবাদকে আঘাত করিবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে বটে কিন্তু, আমাদের ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে লড়িবার সুযোগ কোথায়? ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে জনশক্তিকে সমবেত করিবার পথে সাম্রাজ্যবাদ আজও সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

প্রথমে দেখা যাক আমাদের নিষ্ক্রিয়তায় কাহার লাভ হইবে। আমরা যদি নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকি তাহা হইলে প্রথম লাভ হইবে আক্রমণকারী শত্রু পক্ষের। তাহারা চাহিবে, জনগণ সংঘবদ্ধ হইবার আগে, সব কথা ভাল ভাবে বুঝিবার আগে, তাহাদের ব্রিটীশ-বিরোধী মনোভাব, ফ্যাশিবিরোধী মনোভাবে

পরিণত হইবার আগে, যাহাতে তাহারা আমাদের অনৈক্য এবং সিদ্ধান্তের অভাবকে কাজে লাগাইতে পারে। কাজেই, আমরা যদি নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে কার্য্যতঃ শত্রুকে সাহায্য করা হইবে। একথা ভুলিলে বিপদ হইবে যে, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের উপর চাপ দিতে গিয়া আমরা জাপানকে পরোক্ষভাবে সহায়তা না করি।

তাহা ছাড়া আমাদের শাসকবর্গের উভয় সঙ্কট এবং অনিশ্চিত মনোভাবের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কার্য্যতঃ যখন সমর প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়ার নীতি কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না, তখন আমাদের নিষ্ক্রিয়তায় শাসকবর্গ কোন চাপ অনুভব করিবেন না। তাঁহারা মনে করিবেন যে তাঁহারাই জোর করিয়া সমর প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে পারেন, কেহ বিরুদ্ধতা না করিলেই তাঁহারা খুশী। বরং আমাদের কার্য্যকলাপকে তাঁহারা সন্দেহের চোখে দেখিতে অভ্যস্ত এবং আমাদের নিষ্ক্রিয়তায় তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন।

অন্য দিকে আমাদের দেখিতে হইবে ব্রিটীশ শাসকবর্গের উপর সবচেয়ে বড় চাপ কোন দিক হইতে আসিতেছে। এই চাপ ব্রিটীশ জনগণের দিক হইতে প্রবল ভাবে আসিয়া তাঁহাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে বাধ্য করিতেছে। ব্রিটীশ জনগণ ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা ও উপনিবেশিক শাসনের স্বরূপ জানিতেন না। তাঁহারা প্রথমে আশা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে তাহার সম্মিলিত জাতীয় বাহিনী লইয়া

যোগদান করিবে। জাতীয় ভারতবর্ষকে যুদ্ধের বাহিরে থাকিতে দেখিয়া অধীর ভাবে তাঁহারা ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাঁহারা জনসাধারণ হইতে সরকারের বিচ্ছিন্নতাকে ভাল ভাবে বুঝিতে পারিতেছেন। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের পুরাতন কাহিনীকে আর বিশ্বাস করিতেছেন না এবং বর্ত্তমান অবস্থার জন্য ব্রিটীশ সরকারকেই দোষী মনে করিতেছেন। আজ যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় শক্তি লইয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত জনসাধারণকে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে, আমরা বৃটেন, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের ফ্যাশিবিরোধী জনসাধারণের সহিত সংযুক্ত হইতে পারিব এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই দেখা যাইবে।

আমাদের শাসকবর্গের দ্বারা সৃষ্ট বর্ত্তমান অচল অবস্থায় অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারে না। হয় ইহা জাপানীরা আসিয়া ভাঙ্গিয়া দিবে, না হয় তাহার পূর্ব্বে ভারতীয় জন-সাধারণকে ব্রিটীশ জনসাধারণের সহায়তায় ইহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। জাপান আসুক, তাহা যখন আমরা চাহি না তখন ব্রিটীশ এবং ভারতীয় জনসাধারণকেই ইহা ভাঙ্গিতে হইবে। ব্রিটীশ এবং ভারতীয় কাহারও পক্ষে এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে। ইহার সুবর্ণ সুযোগও বর্ত্তমানে উপস্থিত।

সাম্রাজ্যবাদ এখনকার মত দুর্ব্বল আর কখনও হইয়া পড়ে নাই। আমরাও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে এত বড় শক্তিশালী সহযোগী আর কখনও পাই নাই; আর ইহার প্রয়োজনও এত

বেশী তীব্র আর কখনও হয় নাই। আজ আমরা যে অসুবিধায় রহিয়াছি আমাদের শাসকবর্গকেই সেই অসুবিধায় ফেলিয়া দিবার সময় আসিয়াছে। ব্রিটীশ সরকারের সহিত জাতীয় ভারতবর্ষ আজ মিটমাট করিয়া ফেলিবার শক্তি রাখে। ভারতীয় জাতীয়তার আজ এই শক্তি হইয়াছে যে, সংকল্প স্থির করিতে পারিলে এই কার্য্যে তাহার বাধা পাইবার সম্ভাবনা নাই। আজ যদি আমরা মিটমাট করিতে পারি, তাহা হইলে বর্ত্তমান শাসকবর্গ ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ আরও বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে ব্রিটীশ জনগণের সহিত ভারতীয় জনগণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। ফ্যাশিষ্ট-পন্থীগণ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। ইহার ফলে যুদ্ধের ভার আমাদের নিজেদের হাতে গ্রহণ করিবার, দেশ রক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন নিজেরা করিবার এবং আমাদের মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার দ্বার আমাদের কাছে মুক্ত হইবে।

আজ উপর হইতে বোধ হইতেছে যে ভারতবর্ষে কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই। আজও সাম্রাজ্যবাদ সকলকে দাবাইয়া রাখিয়াছে; রাজনীতিক দলগুলিকে উপেক্ষা করিবার শক্তি সে হারায় নাই। কিন্তু আসল ব্যাপার তাহা নহে। যুদ্ধের ফলে এবং বিশেষ করিয়া তাহার যুগান্তকারী মৌলিক পরিবর্ত্তনের ফলে, ভারতীয় জাতীয়তার সহিত সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সম্পর্ক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তন

আরও অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের কথা স্মরণ রাখিয়া আমাদের কর্ম্মনীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

দুই বৎসর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে সমগ্রভাবে ভারতীয় জাতির সহিত সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ব্যবধান বিশেষভাবে প্রশস্ত হইয়াছে। সরকারের দমননীতির ফলে সর্ব্বপ্রকার রাজনীতিক মতের লোকই সরকারের পরে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। সরকার সাম্রাজ্যবাদী চালে যে সব রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক বিধান প্রবর্ত্তন করেন, তাহা সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই সমভাবে অসন্তুষ্ট করে। শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, ব্যবসায়পতি সকলেই বুঝিতে পারেন যে তাঁহাদের স্বার্থ পদদলিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তার ফলে আমাদের জাতীয় ঐক্য, স্বাধীনতা লাভের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে নাই। বরং সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াই অবস্থান করিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় শক্তিকে যদিও জাতীয় নেতৃবর্গ কাজে লাগাইতে পারেন নাই, তথাপি আমাদের জাতীয় শত্রুও ইহাকে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিতে পারে নাই। যুদ্ধের সময়ে আমাদের জাতীয় ঐক্য শুধু যে ভাঙ্গে নাই তাহা নহে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ আজ সম্পূর্ণভাবে একক। অনেক চেষ্টা করিয়াও একটা বড় রাজনীতিক দলেরও সমর্থন ইহারা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার প্রতিক্রিয়াশীল সমর্থকেরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। উদারনীতিক দলেরও সরকারী নীতির

মোহ ভাঙ্গিয়াছে। এই অবস্থায় পড়িয়া সাম্রাজ্যবাদ আজ যে ভাবে সমর্থকহীন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এমন আর কোন দিন হয় নাই। অন্যদিকে আমাদের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিও ইহার পূর্ব্বে এত বিস্তৃত আর কোন দিন হয় নাই।

দলবিহীন নেতাগণ হইতে কম্যুনিষ্টগণ পর্য্যন্ত সমস্ত স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি ও রাজনীতিক দলগুলি আজ একই ভাষায় একই দাবীর কথা বলিতেছে। যুদ্ধে ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধে লড়িতে হইবে, ভারতবর্ষকে যুদ্ধে যোগদানের পূর্ণ সুযোগ দান করিতে হইবে। যুদ্ধের অর্থনীতিকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে জাতীয় শিল্প-সম্পদ গড়িবার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব ঐক্যের ভিত্তিতে একদিকে জনগণ সংঘবদ্ধ হইতেছে, অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদ প্রাণপণে এই সকল দাবীকে বাধা দিয়া জনগণের সংস্রব হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদ যতই দূরে সরিয়া যাইতেছে জনগণের ঐক্যের ভিত্তি ততই প্রশস্ততর হইতেছে।

বর্ত্তমান সঙ্কটে সাধারণ দাবীর ভিত্তিতে প্রশস্ততম জাতীয় ঐক্য ও বৃহত্তম জনসমাবেশ সম্ভব হইবে। ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যকে গড়িয়া তোলা এবং যুদ্ধে ভারতের সক্রিয়ভাবে ও অবাধে যোগদানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় কাজ।

চীনের জনগণ, বার্ম্মা মালয়ের জনগণ এবং সর্ব্বোপরি ব্রিটীশ জনগণও একই দাবী করিতেছে। আর সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গও এই দাবীকে সবচেয়ে ভয়ের চোখে দেখিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদের এই অভূতপূর্ব্ব বিচ্ছিন্নতার মুহূর্ত্তে যদি আমরা জাতীয় ঐক্যকে ব্যবহার করি, যুদ্ধকে আমরা নিজের বলিয়া নিজের হাতে গ্রহণ করি, তাহা হইলে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা অভিযানকে প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

আজ সাম্রাজ্যবাদীদের হস্ত হইতে যুদ্ধের নেতৃত্ব আমাদের হস্তে আনিবার জন্য যে সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহাই আমাদের মুক্তিসংগ্রামের আরম্ভ হইবে। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আমাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতালাভের জন্য আমাদিগকে যে চেষ্টা করিতে হইবে তাহার ফলে যুদ্ধের নেতৃত্ব আমাদের হাতে আসিয়া যাইবে এবং এখান হইতেই স্বাধীন ভারতের সূচনা হইবে। বিশ্বের গণমুক্তির যুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে সংঘবদ্ধ করিতে পারিলে এই অভিযান আসলে ভারতেরই মুক্তি সংগ্রামের অভিযানে পরিণত হইবে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ আজ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে পরাভব স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু, আমাদের উপর খবরদারী এখনও ছাড়ে নাই। যুদ্ধে যোগদানের পথে এজন্যই বাধা সৃষ্টি করিবার সুযোগ সে পাইতেছে। আমাদিগকে এই বাধা অতিক্রম করিতে হইবে এবং পথ ও সুযোগ করিয়া লইতে হইবে।

এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগামী বাহিনী,—চীনের জাতীয় বাহিনী জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, জাপানী ফ্যাশিবাদকে নির্ম্মূল করিয়া এশিয়াকে মুক্ত করা তাহাদের সঙ্কল্প। আমরা আজ নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারিনা। ব্রিটীশ জনগণের সহযোগিতার হস্ত প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। শৃঙ্খলিত ইওরোপের নিপীড়িত জনগণের আহ্বানে আমরা বধির থাকিতে পারি না। ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের জনগণের মুক্তিযুদ্ধ, ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ। আজ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়তাকে ভাঙ্গিতে হইবে এবং বাঁচিবার জন্য ও স্বাধীনতা লাভের জন্য এই যুদ্ধকে আমাদের যুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

জাপানীরা আমাদের স্বাধীনতা দিতে পারে না

আমাদের দেশের অনেকের এই বিশ্বাস আছে যে জাপানীদের সহায়তায় আমাদের স্বাধীনতালাভ ঘটিতে পারে। তাঁহাদের ধারণা জাপানীরা অনেক দেশ পাইয়াছে, তাহাদের আর নূতন দেশের দরকার নাই। কাজেই তাহারা ভারতকে অধিকার করিবার চেষ্টা করিবে না, নিজেদের সীমান্ত হইতে শত্রুকে দূরে সরাইয়া দিবার জন্য এবং আমাদের কোন কোন নেতার অনুরোধ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটীশকে তাড়াইয়া দিয়া আমাদের করমর্দ্দন করিয়া তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিবে। ইহার উত্তর অবশ্য পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে এই যুদ্ধের চরিত্র পৃথক পৃথক স্থানে পৃথক পৃথক নয়। অর্থাৎ এমন নহে যে জাপান, ব্রহ্ম, মালয় ও ফিলিপাইনের উপর একরকম ব্যবহার করিবে আর আমাদের প্রতি অন্যরকম ব্যবহার করিবে। অথবা জার্ম্মানী একরকম আচরণ করিবে আর জাপানী অন্যরকম করিবে।

এই প্রসঙ্গে, যুদ্ধের মূল যে কারণ, ফ্যাশিবাদের কেন উদ্ভব হইল এবং তাহার স্বরূপই বা কি তাহাও মনে রাখিতে হইবে। পৃথিবীর শোষণক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। সমস্ত শিল্পপ্রধান দেশগুলির উপযুক্ত বাজার নাই। এজন্য ফ্যাশিবাদের লক্ষ্য ছিল তাহাদের

সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্ম্মূল করিয়া সমগ্র শোষণক্ষেত্র নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লওয়া এবং নূতন দেশকে শোষণ-ক্ষেত্রে পরিণত করা। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন কোনঠাসা হইয়া গেল, তখন বিশ্বসাম্রাজ্য লাভের পথে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় বিশ্ব-বিপ্লবকে ধ্বংস করিবার জন্য ফ্যাশিবাদের সর্ব্বশেষ অভিযান। তাহার বিরুদ্ধে শক্তির যে সমাবেশ হইয়াছে তাহাতে, হয় তাহাকে চূড়ান্ত জয়লাভ করিয়া বিশ্বভোগের পথ পরিষ্কার করিতে হইবে, না হয় তাহাকে নিঃশেষে ধ্বংস হইতে হইবে। অর্দ্ধপথে থাকিবার উপায় নাই। জার্ম্মানীর পরাজয় জাপানের বিজয়কে এক সপ্তাহে ব্যর্থ করিয়া দিবে আর জাপানের অপ্রতিহত অভিযান জার্ম্মানীকে টিঁকিয়া থাকিবার পক্ষে প্রতি মুহূর্ত্তে সহায়তা করিবে।

অপর দিকে সোভিয়েট রুশিয়ার বিজয়ে পৃথিবীর গণশক্তি মুক্তি পাইবে এবং সমগ্র পৃথিবীর এই গণশক্তি কোটী কোটী হস্তের আঘাতে শত্রুকে দুর্ব্বল করিয়া দিবে। এইজন্য এই যুদ্ধ অখণ্ড ও অবিভাজ্য। এইজন্যই ফ্যাশিবাদ জয়ী হইলে পৃথিবীর কোন অংশকে সে স্বাধীন থাকিতে দিতে পারে না। শোষণক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী গড়িয়া উঠিতে পারে এমন সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট না করিয়া তাহার উপায় নাই। বিপ্লবের শক্তিকেও কোন আশ্রয়স্থল দিতে সে রাজী হইতে পারে না। এইজন্যই জয়লাভের পরও ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান জাপানের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহার নয়াবিধান

প্রবর্ত্তনের 'তানাকা পরিকল্পনা' নক্সায় স্বাধীন ভারতের স্থান নাই। কাজেই জাপানীর সাহায্যে স্বাধীনতালাভ অলীক কল্পনা এবং দেশের সঙ্কট মুহূর্ত্তে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নহে।

ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কেহ কেহ বলেন, শাসকশ্রেণীর সঙ্কটের সময় শত্রুর সহায়তায় স্বাধীনতালাভ অসম্ভব নহে। কিন্তু, অন্য যুদ্ধ হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের যে মূলগত পার্থক্য, সে পার্থক্যকে গণনার মধ্যে না আনায় তাঁহারা এই আশা পোষণ করিতেছেন। এই যুদ্ধ যদি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থাকিত এবং উপনিবেশিক ভাগবাটোয়ারা ব্রিটীশদল ও জার্ম্মানদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে হয়ত দেশের আভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান শত্রুর সহায়তায় শক্তিশালী ও পুষ্ট হইয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে পারিত। উভয়দল সাম্রাজ্যবাদীর মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রত্যেক দলের মধ্যেও আবার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ত্তমান থাকিত, তাহার ফলে এই স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষা হয়ত-বা করা যাইত। কিন্তু, বর্ত্তমানে অবস্থা তাহা নহে।

ফ্যাশিবাদ প্রতিযোগী সাম্রাজ্যবাদীদলকে নির্ম্মূল করিতে চাহিয়াছে এবং বিপ্লবের শক্তিকেও ধ্বংস করিতে চাহিতেছে। আন্তর্জাতিক ফ্যশিবাদের কাঠামোর মধ্যে ফ্যাশিবাদের শক্তিকে সংহত করিয়া এবং সমগ্র বিশ্বকে শোষণক্ষেত্রে পরিণত করিয়া আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগীতাকে আপাতত নষ্ট করিবার আশা করিতেছে। এই অবস্থায় ফ্যাশিবাদের সম্মুখে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী

থাকিবে না এবং বিপ্লবের শক্তি চূর্ণ হইয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া বিপ্লবের শক্তিকে তাহার চূর্ণ করিতেই হইবে, তাহাকে মাথা গুজিবার মত স্থান সে দিতে পারে না। ভারতবর্ষের মত একটি বিরাট দেশকে বিপ্লবের দুর্গ করিয়া সে রাখিতে পারে না। বরং এখানে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ থাকুক তাহা সে সহিবে—তবু স্বাধীন ভারতকে সহ্য করিবে না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কথায় যাহারা বিশ্বাস করিতেছে, এবং এই সকল কথা যাহারা ছড়াইতেছে, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক তাহারা ফ্যাশিষ্টদের চর হিসাবে এখানে কাজ করিতেছে। ফ্যাশিষ্টরা জানে যে সাম্রাজ্যবাদী বেতনভোগী সৈন্যদলের এমন সাধ্য নাই যে তাহাদের গতিরোধ করে। বার বার বহুক্ষেত্রে তাহারা একথার প্রমাণ পাইয়াছে। তাহারা ইহাও জানে যে জাগ্রত গণশক্তি, এবং স্বাধীনতা রক্ষায় ও স্বাধীনতা অর্জ্জনে দৃঢ় সঙ্কল্প জনগণের হাতেই তাহারা একমাত্র পরাজিত হইতে পারে। ইহার তিক্ত আস্বাদ জাপানীরা কয়েক বছর ধরিয়া চীনে পাইতেছে, সোভিয়েটের অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকাও জার্ম্মানীকে এই শিক্ষা দিতেছে; এবং কড়া সামরিক শাসনের ফাঁকেও মাথা তুলিয়া ইওরোপের ক্ষুব্ধ জনগণ ফ্যাশিষ্ট জার্ম্মানদের এই শিক্ষাই দিতেছে।

এইজন্য ফ্যাশিষ্টরা যখন সামরিক শক্তিকে নিখুঁত ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে তখন, দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত ও সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য ফ্যাশিষ্ট অনুচরদের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইহারাই হইতেছে স্বাধীনতার শত্রু, জনগণের শত্রু, বন্ধুর ছদ্মবেশে শত্রুর পঞ্চমবাহিনী।

আমাদের দেশেও ইহারাই অপস্রিয়মান ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের কুকীর্তিসমূহকে বড় করিয়া ধরিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষকে বাড়াইয়া তুলিতেছে। উদ্দেশ্য, এই ব্রিটীশ বিদ্বেষের ফলে জনগণ যুদ্ধসম্পর্কে নিষ্ক্রিয় হইবে, তাহাদের মধ্যে অনৈক্য ও মতবিরোধ দেখা দিবে এবং এই বিশৃঙ্খলা ফ্যাশিষ্টদের কাজে লাগিবে।

এতদিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন করিয়া আজ ইহারা সহসা স্বদেশপ্রেমিক ও ব্রিটীশ বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে (অবশ্য গোপনে) এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহাদের প্রচারের দুইটি হইতেছে প্রধান কথা। প্রথমে ইহারা বলিতেছে, জাপানীরা ভাল মানুষ, তাহারা ভারত-বাসীদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিবে না। ব্রহ্মে ও মালয়ে ভারতীয়দের প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করিয়াছে এবং এখানেও তাহারা ভারতবাসীদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে। এই কথার দ্বারা তাহারা জনগণের সাময়িক দুর্ব্বলতাকে কাজে লাগাইতে চাহিতেছে। কারণ, জনগণের মধ্যে জাপানীদের অত্যাচার সম্পর্কে আতঙ্ক আছে এবং তাহাদের মধ্যে ইহা জাপ-বিরোধী মনোভাব গঠনে সহায়তা করিতেছে। ইহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে, জনসাধারণকে এই কথা বলা যে তোমাদের ব্যস্ত হইবার কারণ নাই, জাপানীরা কোন অত্যাচার করিবে না, বর্ত্তমানের

অত্যাচার অবিচার দূর হইবে এবং তোমরা সুখে থাকিবে,—জাপানীদের বিরুদ্ধে দল বাঁধিয়া মিছামিছি তাহাদের বিরাগভাজন হইওনা। ইহাতে জনগণের জাপবিরোধী সংকল্প গঠনে বাধা জন্মিবার কথা।

দ্বিতীয়তঃ ইহারা পরম উৎসাহে সোভিয়েটের পরাজয়ের নূতন নূতন সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে রটাইতেছে এবং বলিয়া বেড়াইতেছে হিটলারের জয়ে শেষ পর্য্যন্ত কোন সন্দেহ নাই। এ কথাটা এমনভাবে প্রচার করা হইতেছে যেন, হিটলারের জয়ে ভারতবাসীদের স্বার্থ আছে এবং তাহাই ভারতবাসীদের কাম্য। সংবাদের সূত্র আবার গোপন ও রহস্যজনক। কাহারও টোকিও রেডিও—কাহারও বার্লিন রেডিও—কাহারও সংবাদের সূত্র তদপেক্ষাও বিশ্বাসযোগ্য। ইহাদের কলকোলাহলে দেশের আকাশ বাতাস এতটা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে, যাঁহারা সত্যকারের কর্ম্মী, যাঁহারা ফ্যাশিবিরোধী মনোভাব গঠনে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে এই শ্রেণীর লোকেরা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম শ্রেণীসংগ্রাম

ফ্যাশিষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, বৃটেন এবং অমেরিকার এই যুদ্ধকে সাধারণ যুদ্ধ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। ইহা প্রতিবিপ্লব এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের অগ্রবর্ত্তী বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী বিরাট শ্রেণী-সংগ্রাম। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের শিবিরের নেতৃত্ব আজ হিটলার-ফ্যাশিষ্টদের হাতে। বিশ্ববিজয়, সমগ্র বিশ্বকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাই তাহাদের লক্ষ্য। তাহাদের বিজয়ে জার্ম্মান, অষ্ট্রিয়ান, ইটালিয়ান এবং জাপানী জনগণের দাসত্বই শুধু দীর্ঘ-স্থায়ী হইবে না সমস্ত জগৎই ফ্যাশিসাম্রাজ্যবাদের দাস হইয়া পড়িবে। এই বর্ব্বর যুদ্ধে তাহারা শুধু তাহাদের সামরিক শক্তি অথবা অধিকৃত স্থানের সামরিক সুবিধার উপর নির্ভর করিতেছে না। তাহারা প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের শিবিরে যে ফ্যাশি অনুচরের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের উপরই সমধিক নির্ভর করিতেছে।

শাসকবর্গের মধ্যে প্রত্যেক দেশে যে সব পরিবর্ত্তন বিরোধী বড় সাহেবের দল আছে তাহাদের উপরেও ইহারা কম নির্ভর করিতেছে না। প্রত্যেক দেশে ধনিক শ্রেণীর মধ্যে ইহারা যে পঞ্চমবাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই হইতেছে ইহাদের রাজনীতিক অস্ত্র, আর উপনিবেশিক জাতিদের মধ্যে

ওয়াং-চিং-উই-এর ন্যায় স্বার্থপর ভেদ সৃষ্টিকারীরা হইতেছে ইহাদের সহায়।

জনগণের শিবিরে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জন-বিপ্লবের অগ্রবর্ত্তী বাহিনী, গণ-মুক্তি-সংগ্রামের সেনানী সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতেছে নেতা। সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতেছে সর্ব্বহারাদের রাষ্ট্র—জনগণের রাষ্ট্র। যখন ইহা ফ্যাশিষ্ট আক্রমণকারীদের হাত হইতে নিজের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করিতেছে, তখন সেই যুদ্ধ অন্যান্য জাতির মুক্তির পথকে প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। ফ্যাশি-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই নিদারুণ সংগ্রামে ইহা নিজ দেশের জনগণের অখণ্ড ঐক্যের উপর নির্ভর করিতেছে, এবং আরও নির্ভর করিতেছে, বিশ্বের-জনগণ ও শ্রমিকদের উপর। ফ্যাশিষ্ট দেশগুলির শ্রমিক ও জনগণ ইহার বাহিরে নহে।

যুদ্ধ যতই অগ্রসর হইতেছে পৃথিবীর জনগণ ততই ফ্যাশি-বাদের ধ্বংসের জন্য এবং নিজেদের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হইতেছে। প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিবাদের বন্ধু সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যেক দেশে জনগণের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে ব্যহত করিতেছে কিন্তু, তাহারা প্রতিদিনই বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

অন্য দিকে ফ্যাশিষ্ট শিবিরে ইহার বিপরীত ব্যাপারই ঘটিতেছে, ফ্যাশিষ্টদের জোর করিয়া চাপান দাসত্বের ঐক্য প্রতিদিনই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ফ্যাশিষ্ট শক্তিবর্গের মধ্যে এবং তাহাদের শাসক দলগুলির মধ্যে অনৈক্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। অধিকৃত দেশ সমূহে তাঁহাদের তাঁবেদার সরকার ও

জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে এবং ইটালি, জাপান, অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর শৃঙ্খলিত জনগণের বিদ্রোহের সুর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতেছে।

আজ বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের দুইটী বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। জার্ম্মানী জাপান এবং ইটালির ফ্যাশি-সাম্রাজ্যবাদীরা কয়েক বছর আগেই তাহাদের যুদ্ধের নীতি স্থির করিয়া রাখিয়াছিল! তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যিক দলের মর্ম্ম কেন্দ্রে আঘাত হানিয়াছে, গণবিপ্লেবর প্রতিষ্ঠা ভূমির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যিকদের দূর উপনিবেশ সমূহের দুর্ব্বল স্থানগুলি আক্রমণ করিয়াছে।

ইহারা যুদ্ধ নীতি এবং সামরিক শক্তির উপরই একমাত্র নির্ভর করে নাই। রাজনীতিক শক্তি ও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্য-বাদীদের উপরই ইহারা বেশী নির্ভর করিয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীরা জনসাধারণের হাতে পৃথিবী ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা ফ্যাশিষ্টদের সহিত মিটমাট শ্রেয় মনে করে। ফ্যাশিষ্টদের নীতি হইতেছে পৃথিবীর আধিপত্য তাহারা রক্ষা করিবে এবং বৃটীশ ও আমেরিকাকে সাম্রাজ্যের ক্ষুদে অংশীদার করিয়া লইবে। সমস্ত জগতে ফ্যাশি প্রভুত্ব স্থাপন করা এবং সোভিয়েটকে ধ্বংস করাই ইহার লক্ষ্য।

ফ্যাশিষ্ট নীতি হইতেছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের নীতি। বিশ্ব-সাম্রাজ্যের সঙ্কট হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে। ফ্যাশিতন্ত্র ব্যতীত বিশ্বে দাসত্বকে কায়েম রাখিবার সাধ্য সাম্রাজ্যবাদের

নাই। ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদ সাধারণ ও স্থায়ী সঙ্কটের সময় ফ্যাশিবাদের রূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। হিটলার, রেডিওর মারফৎ তাহার প্রতিযোগী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আবেদন জানাইতেছে—তোমরা কি পাগল হইয়াছ—তোমরা কি বলশেভিকদের কাছে জগত বিলাইয়া দিতে চাহিতেছ—তোমরা কি জগতে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা চাও ?

কিন্তু এ যুদ্ধে ফ্যাশিবাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বহারাগণ আজ তাহাদের প্রিয় নেতা কমরেড ষ্টালিনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প। সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকগণ, সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণ এই মুক্তি যুদ্ধের সৈনিক। তাহারা ফ্যাশিবাদ এবং বিশ্বসাম্রাজ্যবাদকে বাঁচিতে দিবে না, তাহারা মানব জাতিকে বাঁচাইবে—নূতন জগত সৃষ্টি করিবে। ফ্যাশিষ্ট দস্যুদলের নেতা হিটলারই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান শক্তিশালী শত্রু। হিটলারের পতনই জনগণের জয়ের প্রধান সোপান। তাই জনগণের অগ্রবর্ত্তী বাহিনী অপরাজেয় লালফৌজ এবং সোভিয়েট জনগণ হিটলারকে আঘাত করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে।

শত্রুর পশ্চাৎভাগে নাৎসী অধিকৃত ইওরোপ এবং খাস জার্ম্মানীতে বিপ্লবের ঝটিকা আসন্ন। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় জনমতের শক্তিশালী সমাবেশে সমরসম্ভার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে, শাসকবর্গের উপর চাপ পড়িতেছে এবং দ্বিতীয় ফ্রণ্টে শত্রুকে আঘাত হানিবার চেষ্টা চলিতেছে। চীন, ভারত,

বর্ম্মা, মালয়, ইণ্ডোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনে সোভিয়েট সমর্থিত গণ-সংগ্রাম এবং মার্কিন-বাহিনীর আক্রমণ, জাপানী ফ্যাশিষ্টদের ধ্বংস-সাধন করিবে। মধ্যপ্রাচ্যে হিটলারের পার্শ্ব আক্রমণ ইরাণ এবং আরবের জনগণের সহায়তায় প্রতিরুদ্ধ হইবে।

যদিও ফ্যাশিষ্ট সেনাদল প্রাথমিক সুবিধা লাভ করিয়াছে, তবুও পৃথিবীর জনগণের বিপুল শক্তিশালী বাহিনী অপরাজেয়। ইহাদের জনবল ও সম্পদ অফুরন্ত। লালফৌজ এবং সোভিয়েটের জনগণ ইহার পথপ্রদর্শক। সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে এই যে বিরাট শক্তি সমাবেশ, ইহার জয়ের পথ কেহই অবরুদ্ধ করিতে পারে না। তবুও আজ বিপদের আশঙ্কা আছে। আজও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অনেক ক্ষেত্রে এমন লোক রহিয়াছে, যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে। যাহারা উপনিবেশসমূহের বিরাট জনসংখ্যাকে পূর্ণ সহযোগিতার অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাহিতেছে। কিন্তু, বিশ্বের জনগণ এই বিপদ সম্বন্ধে ক্রমেই সচেতন হইতেছে এবং জয়ের পথে এই বাধা তাহারা নিশ্চয়ই দূর করিবে। জনগণের জয় সুনিশ্চিত।

বিপদের কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। দেশে দেশে জনগণ যদি অতন্দ্র হইয়া নিরলসভাবে কাজ করিয়া যাইতে না পারেন, দেশে দেশে সাম্যবাদী দল জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে না পারেন, তাহাদের সর্ব্বশক্তি ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুযোগ, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিপদকে ডাকিয়া আনিতে পারে।

সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন

ভারতবর্ষ আজ বিষম সঙ্কটের সম্মুখীন। ফ্যাশিষ্ট-দস্যু দ্বারে করাঘাত করিতেছে। যে-কোন মুহূর্ত্তে দুর্জ্জয় অভিযানে সে দেশের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। আমাদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে চীনের বিপ্লবী জাতীয় বাহিনীকে পিষিয়া মারিতেছে। আজও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ যোগদানের বাধা অপসারিত হয় নাই। কাজেই এখনই দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের শাসকবর্গ আজও আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন বলিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া আমাদের বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই যুদ্ধ আমাদেরই মুক্তি যুদ্ধ। শাসকবর্গ দায়ে পড়িয়া আমাদের হইয়া এই যুদ্ধ লড়িতে বাধ্য হইতেছেন। জনগণকে যুদ্ধ প্রচেষ্টা হইতে দূরে রাখিয়াই সাম্রাজ্যবাদকে এখানে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মুক্তিকামী বিশ্বের জনগণ, বৃটেনের জনগণ ও আমেরিকার জনগণ এবং আমাদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া দিতেছেন। এই অচল অবস্থার অবসানের জন্য জাতির সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া রাজনৈতিক সকল দলকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। জাতির সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে সাম্রাজ্যবাদকে তাহার পুরাতন নীতি ত্যাগ করিতেই হইবে।

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কৃষাণ সভা, ছাত্রফেডারেশন প্রভৃতি সমস্ত রাজনীতিক শক্তি একই সম্মিলিত বাহিনীতে মিলিত হইলে ব্যাপকতম জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হইবে এবং আমাদের জাতি অপরাজেয় হইবে। এই ঐক্যের মধ্য দিয়াই যুদ্ধকে আমরা নিজের হাতের মধ্যে লইতে পারি। আমাদের রক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেরাই গড়িয়া তুলিতে পারি এবং মুক্তিযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারি। আর যদি আমরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত থাকি তাহা হইলে বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যে থাকিতে হইবে এবং অসহায়ভাবে কঠোরতর দাসত্বের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন জনগণ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে। আজ আমরা জনগণের শক্তির উপর নির্ভর করিব—না সাম্রাজ্যিক শাসকবর্গের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের জন্য বসিয়া থাকিব? সমগ্র জাতির সম্মুখে, প্রত্যেক রাজনীতিক দলের সম্মুখে প্রত্যেক দেশ-প্রেমিকের সম্মুখে আজ এই প্রশ্ন বড় হইয়া দেখা গিয়াছে। বিপদ সকলেই বুঝিতেছেন কিন্তু, আজও মুক্তি সংগ্রামের জন্য সম্মিলিত হইতে পারেন নাই। সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মিলিত হইতে পারিলে চল্লিশ কোটী লোকের বিপুল শক্তি ফ্যাশিবাদকে নির্ম্মূল করিবার জন্য আজ বাধা মুক্ত হইত।

আমাদের সংখ্যাতীত জনগণের শক্তিকে কাজে লাগাইতে হইলে জাতীয় ঐক্যকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই জাতীয়

ঐক্যই ফ্যাশিষ্ট প্রতিরোধের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হইবে। আজ নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। জাতীয় ঐক্যের শক্তির আঘাতে অচল অবস্থার অবসান করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গের নিকট হইতে কোনপ্রকার প্রতিশ্রুতির আশায় বসিয়া না থাকিয়া অতন্দ্রভাবে ফ্যাশিষ্ট দস্যুদের প্রতিরোধ করিবার জন্য জনগণকে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে এবং এই ভাবে যুদ্ধের নেতৃত্ব জনগণের হাতে আনিতে হইবে।

আজ জাতীয় ভারতকে একথা সুস্পষ্টভাবে বলিতে হইবে যে, ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের বুঝিতে হইবে সোভিয়েট রুশিয়া, গ্রেটবৃটেন ও চীন সম্মিলিতভাবে ফ্যাশিষ্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে একত্রে লিপ্ত হইয়াছেন তাহা ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের যুদ্ধ। সোভিয়েট রুশিয়া এবং অন্যান্য জাতির জয়ের জন্য, ফ্যাশিবাদের ধ্বংসের জন্য, সমস্ত জাতির স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল জনগণের সহিত একত্রে দাঁড়াইয়া এই যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে লড়িতে হইবে। ফ্যাশিবাদের সুনিশ্চিত ধ্বংস হইবে, এই যুদ্ধে সোভিয়েট নেতৃত্বে পৃথিবীর জনগণ মুক্তিলাভ করিবে।

বিশ্বের এই গণযুদ্ধে ভারতীয় জনগণের অংশ গ্রহণের ফলে কি এখানে সাম্রাজ্যবাদের কাছে তাহাদের আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, না দাস, প্রভুকে যেভাবে সাহায্য করে, সেইভাবে সাহায্য দান করা হইবে? ইহার কোনটিই নহে। বরং সাম্রাজ্যতন্ত্রের

সহিত লড়িয়া গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ ও জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই ভাবেই, যুদ্ধ প্রচেষ্টার পথে সাম্রাজ্যিক বাধা চূর্ণ হইবে এবং আমাদের জাতীয় স্বার্থও পুষ্ট হইবে। এইভাবেই ফ্যাশিবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের সহিত জাতীয় ঐক্যের সংযোগ স্থাপিত হইবে। এই দেশ, ভারতের সমগ্র জনবল ও ঐশ্বর্য্য ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

কিন্তু সঙ্কট যখন এইভাবে ঘনীভূত, প্রয়োজনের তাগিদ যখন এইপ্রকার তীব্র তখনও আমরা আমাদের কর্ত্তব্যের যথাযথ অংশ সম্পাদন করিতে পারি নাই। আজও আমাদের সংগ্রাম শক্তির এক বৃহৎ অংশ নিক্রিয়তায় নিমগ্ন, আজও অনৈক্যে আমরা বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত। আজও আমাদের নেতৃবর্গ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী বদান্যতার উপর নির্ভরশীল।

আবার এই অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কম্যুনিষ্টরাই ঐক্যের ও মিলিত কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান দিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে সম্মিলিত হইতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহারা নিম্নের প্রস্তাবগুলি দেশের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন।

১। ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারের স্বীকৃতি।

২। কেন্দ্রে জাতীয় সরকার স্থাপন, এই গভর্ণমেণ্ট আইন সভার কাছে দায়ী থাকিবেন এবং গভর্ণমেণ্ট, শাসনবিভাগ এবং যুদ্ধ-পরিচালনার উপর ইহাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে।

৩। সমস্ত রাজনীতিক ও আটকবন্দীদের মুক্তিদান। যে সকল জরুরী আইনে বক্তৃতা, সংবাদপত্র, কোন প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন এবং ধর্ম্মঘটের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়াছে তাহার সবগুলির প্রত্যাহার।

৪। দ্রুত শিল্প-সংগঠনের নীতি গ্রহণ করা ও উৎপাদন-হার এরূপে বৃদ্ধি করা যাহাতে দেশরক্ষা, যুদ্ধ এবং জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা মিটিতে পারে।

৫। শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লওয়া এবং তাহাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে তাহাদের জীবনযাত্রা ও কার্য্যের মান উন্নততর হইবে এবং তাহাদের ঐক্যবদ্ধ হইবার ও ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।

৬। কৃষকদের দাবী মানিয়া লওয়া ও তাহাদের ঋণ, কর, ট্যাক্সের ভার হ্রাস করা, তাহাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রন করা, দুর্ভিক্ষ এবং বন্যাপীড়িত অঞ্চলে এই সব অকৃপণ ভাবে মকুব করা, খাদ্যশস্য উৎপাদনে সাহায্য করা এবং যুদ্ধের জন্য যে সকল দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে তাহার উৎপাদনে কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা (যেমন তাঁতশিল্প)।

৭। যুদ্ধ প্রচেষ্টায়, সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববিধ জুলুম বর্জ্জন করা।

৮। যুদ্ধের বোঝা সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া।

ভারতের সকল দলের লোকের পক্ষেই এই

প্রস্তাবগুলি গ্রহণযোগ্য। ইহার মধ্যে ভারতের জাতীয় দাবী মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহা তাঁহাদের স্বার্থকেও সকল দিক দিয়া অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। যে সকল দল ও প্রতিষ্ঠান ভারতের স্বাধীনতা চাহেন, তাহাদের প্রত্যেকেই অন্যান্য দাবীর সহিত এ দাবীগুলি করিয়া থাকেন। কাহারও মূল লক্ষ্য এ আদর্শ হইতে ক্ষুন্ন হইবে না। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, শ্রমিক কংগ্রেস, কৃষাণ সভা, ছাত্র ফেডারেশন সকলেই এই মূল ভিত্তির উপর মিলিত হইয়া দাঁড়াইলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার কর্ত্তৃত্ব তাহাদের হাতে চলিয়া আসিবে। তাঁহারাই ভারতের রক্ষা ব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন, তাঁহারাই জাতির মুক্তি প্রচেষ্টাকে সার্থক করিতে পারিবেন।

কাজ করিয়া যাইতে হইবে

প্রস্তাবিত ভিত্তিতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ঐক্য এই নিদারুণ সঙ্কটের মুহূর্ত্তে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইবে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মিলিত পতাকার নীচে জাতীয় শক্তির এতবড় সমাবেশ হইবে, যাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই। ইহা জাতির মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস জাগাইবে এবং এই মুক্তিযুদ্ধে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবার প্রেরণা জাগাইবে। তাহারা বুঝিতে পারিবে, এই যুদ্ধই তাহাদের যুদ্ধ।

সাম্রাজ্যিক শক্তি যখন বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল, তাহার আচরণ যখন দিশাহারা অন্ধের ন্যায় সেই সুযোগে জনগণ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে এবং নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে নিজের হাতে লইয়া আসিতে পারিবে। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের জাতীয় শক্তির যে বিপুল উদ্বোধন হইবে, তাহা অভূতপূর্ব্ব। দুর্ব্বল সাম্রাজ্যবাদের তাহাকে বাধা দিবার সাধ্য নাই। জনগণের শক্তি আজ সমগ্র জগতে কঠোর বাস্তব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনযুদ্ধে, রুশিয়ার সুদীর্ঘ রণাঙ্গণে এবং চীনা বাহিনীর বিস্ময়কর বীরত্বে তাহা চিরকালের জন্য অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এই সম্মিলিত সংগ্রামে জনগণের মধ্যে যে চেতনা ও কর্ম্মশক্তি জাগ্রত

হইবে, তাহাই তাহাকে সাম্রাজ্যবাদী স্বেচ্ছাচারিতার হাত হইতে মুক্তি দিবে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রথমে কংগ্রেস যখন মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন তখন, এই ভাগ বাঁটোয়ারার যুদ্ধের সংশ্রব হইতে দূরে আসিয়া তাঁহারা ঠিকই করিয়াছিলেন। কারণ, পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে গণ-আন্দোলনকে দাবাইয়া রাখা ছাড়া সেখানে আর কোন কাজ করিবার সুযোগ ছিল না। সেদিন তাঁহারা গণ-আন্দোলনকে সুনজরে দেখিতে পারেন নাই এবং সর্ব্ব-প্রকারে তাহাকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রথম আঘাতেই সাম্রাজ্যিক সরকার তাঁহাদের এই মোহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে জনগণই হইতেছে প্রকৃত শক্তির উৎস।

আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ আমাদের সমগ্র গণ-শক্তির যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যোগদানের পথে সাম্রাজিক বাধাকে অপসারিত করিতে হইবে। বিপুল হইতে বিপুলতর জন-সমাবেশ করিতে হইবে—ঐক্যকে গভীর হইতে গভীরতর করিতে হইবে। এইজন্য আজ আবার পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি জনস্বার্থ এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। জনগণের প্রতিনিধিরা ক্ষমতার আসন হইতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। জাতীয় নেতাগণের হাতে শাসনক্ষমতা চলিয়া আসিবে, জনগণ কাজ করিবার সুযোগ পাইবে, যুদ্ধশিল্প

গড়িয়া উঠিবে, সমর-প্রচেষ্টা পরিপুষ্ট হইবে এবং আমাদের মুক্তিচেষ্টা সার্থক হইবে। এইজন্যই গণসংগ্রামের সঙ্গে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির ঘনিষ্ট সংযোগ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

জাতীয় স্বার্থের দাবী হইতেছে, কালবিলম্ব না করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করুন এবং লীগের সহিত এই সর্ত্তে সম্মিলিতভাবে তাহা গ্রহণ করুন যে, জাতীয় ঐক্যের দাবী-গুলিকে তাঁহারা যথাসাধ্য পালন করিবেন এবং আইন-সভার বাহিরে গণ-আন্দোলনকে বাধামুক্ত করিবার চেষ্টা তাঁহারা সমর্থন করিবেন।

জাতীয়-ভাবাপন্ন জনগণের সহিত মুসলিম জনগণের এই পার্লামেণ্টারি ঐক্য—জনগণের ফ্যাশিবিরোধী ঐক্যকে সুদৃঢ় করিয়া দিবে, সাম্প্রদায়িক অশান্তি বাধাইবার সুযোগ নষ্ট করিয়া দিবে এবং আমাদের অনৈক্য লইয়া যাহারা বেসাতি করিতেছেন সেই সাম্রাজ্যিক সরকারকে বিহ্বল করিয়া ফেলিবে। জনগণের দাবীর সহিত যখন প্রাদেশিক মন্ত্রীদের সম্মিলিত দাবী মিলিত হইবে তখন তাহার সম্মুখে সাম্রাজ্যিক সরকারকে মাথা নত করিতে হইবে—ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

একথা যেমন বলিতে পারি না যে, স্বাধীনতা না পাইলে ভারত যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যোগদান করিতে পারে না, তেমনই একথাও বলিতে পারি না যে, জাতীয় সরকার না পাইলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা যাইবে না। আবার এ কথাও মনে করা ভুল হইবে যে,

মন্ত্রীত্বগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুদ্ধ-প্রচেষ্টা হইতে দূরে থাকিতে হইবে; ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের নিষ্ক্রিয় থাকিতে হইবে। জনগণের মধ্যে ফ্যাশিবিরোধী ভাব যতই বৃদ্ধি পাইবে, তাঁহারা যতই বুঝিতে পারিবেন যে, এই যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে তাঁহাদের মুক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, ততই তাঁহারা জয়লাভের পথের বিঘ্ন অপসারণের জন্য প্রবল চাপ দিবেন এবং এই চাপ পূর্ব্বালোচিত পথেই অগ্রসর হইবে।

ভারতের প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারের উপর বিপুল কর্ত্তব্যের বোঝা রহিয়াছে। দুইশত বৎসরের নিরস্ত্র ও অসহায় জাতিকে আত্মরক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। দূর ও নিকট প্রাচ্য হইতে ফ্যাশিবাদকে নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে। জাতির হাতে অস্ত্র দিয়া কোটী কোটী সৈনিক প্রস্তুত রাখিতে হইবে। প্রত্যেক নর-নারীর হাতে অস্ত্র দিয়া বিরাট প্রতিরোধের প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সাম্রাজ্যিক আর্থিক-বিধানের কাঠামো আজ ধ্বসিয়া পড়িতেছে—সামান্য পরিধেয় বস্ত্র ও আহার্য্য পাওয়া লোকের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। জাতিকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাইবার জন্য, যুদ্ধজয়ের উপযোগী সমর-সম্ভার উৎপাদনের জন্য, জাতীয় সরকারকে সুপরিকল্পিতভাবে বস্ত্র-শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত। ইহার বিপুল সম্পদকে এমনভাবে কাজে লাগাইতে হইবে

যাহাতে ৪০ কোটী লোকের অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব দূর হয়, বিরাট সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্র সজ্জিত করা যায়, এবং সোভিয়েট রুশিয়া, চীন এবং পৃথিবীর অন্যান্য যুদ্ধরত জাতিগুলিকে যুদ্ধজয়ে কার্য্যকরী সাহায্য করা যায়।

এইভাবে আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া নূতন আর্থিক বিধান গড়িয়া উঠিবে, শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে, ৪০ কোটী লোক জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইবে, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য লক্ষ লক্ষ সৈনিক অগ্রসর হইয়া আসিবে, ইহার প্রতি-পদক্ষেপে আমাদের এতদিনের দাসত্বের শৃঙ্খল শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া চূর্ণ হইবে। কিন্তু, জাতি আজও এই পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, জাতীয় নেতৃবৃন্দ আজও সরকারের মুখাপেক্ষী এবং নেতৃবৃন্দের অনৈক্য আজও জাতীয় ঐক্যের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সংশয় ও মোহে জনচিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া আছে। কাজেই, মুক্তিকামী জনগণের উপর, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকের উপর, ফ্যাশিবাদের বিরোধীদের উপর, অপরিসীম দায়িত্বের বোঝা রহিয়াছে। চারিদিক যখন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘনমেঘে যখন সম্মুখের পথ অবরুদ্ধ তখন ইহাদের আলোকের বর্ত্তিকা হস্তে অগ্রসর হইতে হইবে, সন্দেহ ও নৈরাশ্যের স্থানে আশা ও বিশ্বাস লইয়া আসিতে হইবে, নিষ্ক্রিয়তার পাষাণ অবরোধকে কর্ম্মের প্লাবনে ভাসাইয়া দিতে হইবে। ফ্যাশি-বিরোধী মনোভাবকে দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া দিতে হইবে,—

দেশ আক্রান্ত হইলে, যাহাতে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, কারখানায় কারখানায়, কৃষকের কুটীরে কুটীরে, আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়া যায় তাহার জন্য এখনই দেশময় জনরক্ষা বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। আর এই সম্মিলিত জনগণের চাপে নেতৃবৃন্দকে ফ্যাশি-বিরোধী-বাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়াইতে বাধ্য করিতে হইবে। তবেই আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্ট বাধামুক্ত হইবে।

বিনা চেষ্টায় স্বাধীনতা কেহ আমাদের হাতে তুলিয়া দিবে না। প্রতিদিনের উদ্যম ও তৎপরতার মধ্য দিয়াই আমরা লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইব। আর যদি আমরা প্রয়োজনের অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে না পারি, বিশ্বের গণবাহিনী হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি, তাহা হইলে একদিকে যেমন শত্রুর শক্তি বর্দ্ধিত হইবে, অন্যদিকে তেমনই বিশ্বের জনগণের শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্যত মুষ্টি দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে শক্তি ফ্যাশিবাদকে আঘাত করিবার আয়োজনের মধ্যে দানা বাঁধিতে পারিত সে শক্তি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। ইতিহাসের এই অনুকূল মুহূর্ত্তকে আমরা নিষ্ক্রিয়তা ও সংশয়ের মধ্যে নিষ্ফল হইতে দিব না।

শেষ

লগ্ন-ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা